

চিৎসুখী ধ্যানমগ্ন সাধু রোগ শোক দিয়ে বিসর্জ্জন।
বাহ্যজ্ঞান রাখিয়ে বাহিরে বিভুজ্যোতিঃ করে আকর্ষণ।

প্রথমধারা

অমিয় ✱ ভাগবত

শ্রীরঘুনাথ

উপন্যাসে—ভক্তচরিত



শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১২ নং হরীতকী বাগান লেন,

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত



১৩৩০ সাল

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

গ্রাহকপক্ষে ১্ এক টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীরাজকুমার রায়
পশুপতি প্রেস
৩০নং হরীতকীবাগান লেন, কলিকাতা।

উপহার



এই গ্রন্থখানি

আমার



....কে



প্রদত্ত হইল।

তারিখ
সন ।

স্বাক্ষর..............................
....
....

গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান যুগের প্রভাত-কিরণে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের যে পথ দেখিতে পাই, তাহাতে অনেক কথাই মনে হয়। সেই মনে হওয়ার সঙ্গে অতীত ও বর্ত্তমান উভয় পথের পার্থক্যও যথেষ্ট অনুভব করি। ক্ষুদ্র নিষ্কিঞ্চন গ্রন্থকার আমি, আমার দৃষ্টি হয়ত দূরদর্শিনী নহে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে সম্বন্ধে ভবিষ্য-আশঙ্কা ঘনীভূত মেঘরাশির ন্যায় সত্যই সকল আশার উজ্জ্বল-রশ্মি আবৃত রাখিতেছে।

এই বাংলায় বর্ত্তমান বহু মনীষী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক উদিত হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে বহুরূপে অযাচিত প্রতিভা-শক্তি প্রভূতভাবে দান করিয়াছেন, কিন্তু হায়! তাঁহারা কি তাঁহাদের ভাবী বংশধরদিগের জন্য কিঞ্চিৎ সম্পত্তিও রাখিয়া যাইতেছেন? তাহা ত আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বস্তুতঃ ভাষার সজীবতা দান ব্যতীত সে শক্তির ভিন্ন প্রভাব নাই বলিয়াই মনে হয়। আমি তর্কবিতর্ক করিতে চাহি না, কাহারও দোষ দেখাইয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইতেও ইচ্ছুক নহি, তবে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ লেখক কেবল পাশ্চাত্য নীতিরই অনুসরণ করিয়া আমাদের চির-শান্তির পথে যে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহাই আমার ধারণা।

কেন না কাম ও প্রেম এক নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ভোগের ইচ্ছাই কামনা। এই কামনানল নিয়তই ইন্ধনের জন্য লালায়িত। ইহার শেষ নাই। আবার তাহার তৃপ্তি না ঘটিলে ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই কাম ও ক্রোধের সহযোগে জগতে কত না পাপানুষ্ঠান সাধিত হইতেছে!

সুতরাং দেশের ও সমাজের অন্তর, মধ্য ও বাহিরে সেই কামোদ্দীপক প্রসঙ্গ বা চিত্র যাহাতে কোনরূপে স্পর্শ না করে, এরূপ সংযত লেখনী পরিচালনে যে লেখক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন, তিনিই সুলেখক এবং তাঁহার গ্রন্থই সদ্‌গ্রন্থ। তাহা কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস, জীবন-চরিত বা নাটকাদি যাহাই হউক না কেন?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপস্থিত সময়ে যে সকল উপন্যাস-স্রোতে দেশ প্লাবিত, তাহার অধিকাংশই আবর্জ্জনাবহুল-পঙ্কিল। সেই অধঃপতিত স্রোতে আমাদের ভাবী বংশধরগণ দিক্‌হারা হইয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। সে উচ্ছৃঙ্খল গতির দৃশ্যে প্রাণে স্বতঃই স্নেহের সঞ্চার হয়। তখনই মনে হয়, ইহার নিয়ন্তা কি নিষ্ঠুর। আবার মনে হয়, তাহাদের উদ্ধারের কি উপায় নাই? যদি এই বৃদ্ধ জীবনে পারি, তাহারই চেষ্টা করি। তাই এই গ্রন্থ-প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে কামের গন্ধ বা মাদকতা নাই। প্রেমের মধ্যে যে মধুর রস নিহিত, যাহাতে চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া দেয়, যাহা নিরাবিল আনন্দ ও শান্তিপ্রদ এবং

যাহা প্রকারভেদ-ভ্রম-নিরাশকারী, ইহাতে সেই গঙ্গাধারার ন্যায় পবিত্র প্রেমের ধারা প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জানি না, আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ কিরূপ তৃপ্তি পাইবেন, তবে আশার কিঞ্চিৎ সফলতা দেখিলেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

কল্যাণপুর, হাওড়া;
১৩৩০ সাল।
শিব-চতুর্দ্দশী



গ্রন্থকার

প্রথম ধারা

অমিয় ✱ ভাগবত

শ্রীরঘুনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"রঘুনাথ।"

অমনি প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কুটীর হইতে একটী শিশু উৎসাহস্ফূরিত মধুর স্বরে কহিল—আজ্ঞে।

শিশু যেন কাহারও আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে ছিল; তাই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর। তখন সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণ। নবাগত, বালকের প্রশ্নোত্তর পাইয়াই বলিলেন, তোমার গ্রন্থ নিয়ে এস।

"যেআজ্ঞে"।

শিশুর সে স্বর আরও উৎফুল্ল, আরও উৎসাহময়। নবাগত সৌম্য নাতি-দীর্ঘকায় পরিণতবয়স্ক ব্রাহ্মণ। তিনি স্নাত। হাতে জলপূর্ণ তামার কমণ্ডলু। তাহার উপর দুই চারিটা শ্বেতপদ্মের পাপড়ী ভাসিতেছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা, কণ্ঠে তুলসীর মালা। দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অতি নিষ্ঠাবান্। পার্থিব সুখদুঃখের মধ্যে ঝরা ফুলের মত নির্ব্বিকার ও উদাসীন। ব্রাহ্ম-

মুহূর্ত্তের ব্রহ্মারাধনার বিমল আনন্দাভা তখনও তাঁহার নির্ম্মল-মুখমণ্ডল হইতে অপসৃত হয় নাই। ব্রাহ্মণের নাম বলরাম আচার্য্য। বাসভূমি সপ্তগ্রামের একটী পরিচিত পল্লী চাঁদপুর। বর্ণিত কুটীরটি সেই চাঁদপুরের নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত। তিনিই এই কুটীরস্বামী। বালকের নাম "রঘুনাথ"। রঘুনাথ তাঁহার ছাত্র ও যজমানের পুত্র।

ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কথা। বহু শান্তি ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া চারি শত বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। তখনকার সামাজিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার তুলনা করিলে পূর্ব্বাবস্থা কল্পিত আখ্যায়িকার ন্যায় বোধ হইবে। তখন বাঙ্‌লা পরাধীন হইলেও বাঙালীরা তাঁহাদিগের মামুলি-আচারভ্রষ্ট হন নাই। বাঙ্‌লায় চাতুর্ব্বর্ণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি সকলেই সামাজিক দৃঢ়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতেন; গৃহী হইলেও সংযম ও অভ্যাস-যোগে অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যাচারী ছিলেন। প্রায়শঃ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কালযাপন করিতেন। যজন-যাজনই তাঁহাদিগের উপজীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতিগণও বিধি-নিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত। কেহই তাহা সংকীর্ণ গণ্ডী বলিয়া উপেক্ষা করিত না। সমাজের একটা জীবনী-শক্তি ছিল। তাহাতে পূর্ণ স্নেহ ও প্রেমের চিত্র সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। বাঙ্‌লার সুনীল আকাশের কোলে এখন যে রঙিন্ মেঘ খেলা করে, তখনও তাহাই ছিল; তবে তখন সে

মেঘের লীলা যে উন্মাদনা জাগাইত, এখন আর তাহা তাহাতে নাই। সে আনন্দ ও সে তৃপ্তি যেন, কৃষ্ণপক্ষে, ষোলকলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দিন দিন হ্রাস পাইয়া নৈরাশ্যময় নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে।

এখনকার মত তখন স্কুল কলেজ ছিল না। গ্রামে গ্রামে চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা ছিল। নিম্নশিক্ষার্থীরা পাঠশালায় নিম্নশিক্ষা লাভ করিত। সম্ভ্রান্ত বা দরিদ্র ছাত্র বলিয়া কোন ইতর বিশেষ ছিল না;—উচ্চবিদ্যার্থীমাত্রই কেহ গুরুগৃহে থাকিয়া, কেহ বা নিজ বাটী হইতে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। বালক রঘুনাথ তৎকালীন আট লক্ষ মুদ্রাধিক—বর্ত্তমানে যাহা এক কোটীরও অধিক—এরূপ আয়ের সম্পত্তির অধীশ্বর সপ্তগ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার হিরণ্য দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

যে সময়ে হোসেন শাহ গৌড়ের অধীশ্বর, সেই সময়ে এই দুই কায়স্থ ভূম্যধিকারী তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। ইঁহাদের উভয় ভ্রাতারই সৎস্বভাব, উদার প্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগ ছিল। দোল, দুর্গোৎসব, পূজা,পার্ব্বণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। ইঁহারা চাটুকারগণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। প্রায়শঃ বৈষ্ণব ভক্তপণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। ১৪১৭ শকে পরম

ভক্ত রঘুনাথের জন্ম হয়। তিনি পঞ্চম বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করেন। পরে সপ্তম, বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া ছিলেন। রঘুনাথ কখনও গুরুগৃহে থাকিতেন, কখনও বা পিতামাতার স্নেহাতিশয্যে নিজবাটী সপ্তগ্রামের নিকট হরিপুর নামক একটী স্থান হইতে অধ্যয়নার্থ তথায় যাতায়াত করিতেন। কথিত সময়ে রঘুনাথ গুরু-কুটীরেই অবস্থান করিতে ছিলেন। গুরুর আহ্বানে বালক শশব্যস্তে পুঁথি লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে কুলপুরোহিত বলরাম সস্নেহে কহিলেন, ভাই রঘুনাথ, রাত্রে মার জন্য মন কেমন করে নাই ত ?

রঘুনাথের মাতা কুলপুরোহিত বলরামকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বলরাম তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে দেখিতেন। তজ্জন্য বলরাম কন্যার পুত্র রঘুনাথকে বাল্যকাল হইতেই "ভাই" সম্বোধন করিতেন। ভবিষ্যতে রঘুনাথ ছাত্র হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি পূর্ব্বসম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই।

অনিন্দ্য সুঠাম গৌরবর্ণ মল্লিকার শুভ্র জ্যোতির মত নির্ম্মল সরল বালক. সরলতার হাসি হাসিয়া কহিল—একটু একটু করিয়া ছিল, আমি মার পাশে শুই কিনা ?

বলরাম ঈষৎ হাসিলেন এবং কহিলেন,কাল অষ্টমী তিথি,পাঠ বন্ধ। আজ তোমায় লইয়া মার নিকট দিয়া আসিব। বাটীতে দুই দিন মার নিকট থাকিয়া আসিবে। এখন মন দিয়া পাঠ কর।

এই কথা শুনিয়া—বসন্ত ঋতুতে যেমন কচি কিসলয়ে

সমুদায় গাছ ভরিয়া উঠে, তেমনি বালকের সর্ব্বগাত্রে পুলক-কম্পন পরিস্ফুটভাবে ফুটিয়া উঠিল। আকাশে তখন ধীরে ধীরে উষার ধূসর পথে সূর্য্যোদয় হইতে ছিল। বালক রঘুনাথের চক্ষে আজ সেই শুভমুহূর্ত্তের সূর্য্যোদয় সাধারণের অগোচরে ও গোপনে বড়ই সুন্দর লাগিতে লাগিল। সে আরও অনুমান করিয়া লইতেছিল, আজিকার সূর্য্যাস্ত আরও সুন্দর আরও মধুর হইবে। কেন না আজি সে অপরাহ্নে সপ্তগ্রামের পুণ্যসলিলা সরস্বতীর মুক্ততটশালিনী সৌধধবল অট্টালিকার নভঃস্পর্শী ছাদে আনন্দময় মাতৃক্রোড়ে বসিয়া এই সূর্য্যের অস্তগমন-বৈচিত্র্য দেখিবে। দুইদিনের পর আজ সে তাহার মায়ের পেটের ভাইবোনের মত শৈশবের সহচর ও সহচরীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া দুইদিনের বুকজোড়া কথা কহিবে। ওগো তাদের ভালবাসার নিকটে সে যে অতি ভিখারী। তারা যে একবার তাহাকে না দেখিয়া মণিহারা ফণীর মত খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে! "রঘু" বলিতে জ্ঞানহারা হয়! খুঁজিয়া না পাইলে এক স্থানে আসিয়া সাতবার অন্বেষণ করে। সে রঘুনাথ আজ দুইদিন তাহাদিগকে ছাড়িয়া গুরুগৃহে আসিয়াছে!

তখন রঘুনাথের ভাবনার বেগ স্রোতের মত যাইতে ছিল। পাঠে আদৌ মন আসিতে ছিল না। শিক্ষক বলরাম রঘুনাথকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, কি ভাই, পড়িতেছ না? ভাল লাগিতেছে না?

উন্মনস্ক রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। যেমন অন্ধকার গৃহে

কেহ দীপ লইয়া আসিলে সেই গৃহের সমুদয় অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ রঘুনাথের সকল চিন্তাই তিরোহিত হইল। বালক পাঠে মনোনিবেশ করিল। পাঠ্যগ্রন্থ হিতোপদেশ। শ্লোক—মিত্রলাভের। রঘুনাথ পাঠ করিতে লাগিলেন,—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

গুরু বলরাম অন্বয় করিতে লাগিলেন, বুদ্ধিঃ লোভেন চলতি, লোভঃ তৃষাং জনয়তে, তৃষার্ত্তঃ মানবঃ পরত্র ইহ চ দুঃখং আপ্নোতি।

রঘুনাথ তাহার বাঙ্‌লা তর্জ্জমা করিয়া বলিলেন—লোভে বুদ্ধি চঞ্চল হয়, লোভ হইতে বাসনা জন্মে, বাসনা হইতেই মানুষ ইহ ও পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে।

এই অনুবাদ করিয়াই রঘুনাথের সেই হর্ষপ্রফুল্ল উজ্জ্বল—চন্দ্রের ন্যায় দীপ্ত মুখখানিকে সহসা একখণ্ড বর্ষার কাল মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিল। তিনি সেই অন্ধকার-গুহার অভ্যন্তর হইতে বলিয়া উঠিলেন, পুরোহিত দাদা, এই লোভ ত সকল মানুষেরই রহিয়াছে, তাহ'লে কি সকল মানুষেই দুঃখী?

"হাঁ ভাই, মানুষমাত্রই দুঃখী-কাঙাল, যতক্ষণ না মানুষ লোভের হাত এড়াইয়া বাসনাকে তাড়াইতে পারে।"

গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়াই বালকের প্রাণে তর্ক জাগিল। রঘুনাথ কহিলেন, হাঁ পুরোহিত দাদা, বাসনা ত ইচ্ছা, ইচ্ছায় মানুষের দুঃখ হয় কেন?

"ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া। তাহাতেই চঞ্চলতা আসে, মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না। কাজেই অশান্তি ও দুঃখ।"

"ইচ্ছা পূর্ণ না হইবে কেন? যে যাহার ইচ্ছা ত পূরণ করিয়া লইতে পারে। আমার হয় ত একটী দ্রব্য নাই, অন্যের রহিয়াছে, আমার লোভ জন্মিল, লোভ হইতে বাসনা বা ইচ্ছা আসিল। আমার অভাব—আমি যে কোনরূপে পূরণ করিয়া লইব, তখন তাহাতে আর কষ্ট কি?

"হাঁ, কষ্টকে কষ্ট না মানিয়া লইলে তাহাতে আর কষ্ট কি? কিন্তু অভাব পূরণের জন্য কায়িক বা মানসিক যে শ্রম, তাহাকে কষ্ট না বলিয়া কি সুখ বলিবে?"

নিজের শুষ্ক তর্ক বুঝিয়া রঘুনাথ অমনি একটী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিলেন।

আচার্য্য বলরাম কহিলেন, "বড় শক্ত কথা ভাই, এখন পড়িয়া যাও, সময়ে একদিন এই শ্লোকের অর্থ তোমাকে স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিবে যে, সংসারে সুখ-দুঃখ জিনিষ দুইটা কি?

হঠাৎ আচার্য্য-গৃহিণী কামাখ্যা ঠাকুরাণী মায়া-মমতায় গড়া করুণা-প্রতিমাখানি সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কি প্রশান্ত তাঁহার মুখ! কি নির্ম্মল তাঁহার দৃষ্টি। পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে হিমশুভ্র কার্পাস-বস্ত্র। অলঙ্কারের কোনও আড়ম্বরই নাই। মাত্র হাতে নারীর সর্ব্বস্ব সাতরাজার ধন এক-মাণিক আয়তি-অভিজ্ঞান "লোহা"। অনিন্দিতা সুগঠিতা তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী আচার্য্য-গৃহিণী আপন নারীত্বের

ও সতীত্বের শত সহস্র গজমুক্তার কণ্ঠী পরিয়া চরিত্রহীনা সম্রাজ্ঞীর হীরার মুকুট ও মণির মালাকে অবজ্ঞায় ধিক্কার দিতেছিলেন। ঠাকুরাণী অতি নম্রভাষিণী। তিনি আসিয়া ধীরে ধীরে নিম্নকণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন, প্রভু, রঘুনাথের পাঠ শেষ হইয়াছে কি? ছেলে মানুষ, অনেকক্ষণ খায় নাই। দুধ গরম করিয়াছি, যদি অনুমতি করেন—

কথার পরিসমাপ্তি না হইতেই আচার্য্য ঠাকুর কহিলেন, বেশ ত, খেতে দাওনা গে। বেলাও হইয়াছে, ছেলে মানুষ, খিদে পাইবে বৈকি! যাও ভাই রঘুনাথ, তোমার বামুন-দিদি, তোমায় ডাকিতেছেন, কিছু খাওগে। আমি ততক্ষণ অপর কাজগুলা সারিয়া আসি।

এই বলিয়া বলরাম গাত্রোত্থান করিলেন। বামুন-দিদি কামাখ্যা ঠাকুরাণী সস্নেহে "এস ভাই, না জানি কত ক্ষুধা পাইয়াছে" বলিয়া রঘুনাথের হাত ধরিলেন। তরুণ সুন্দর রঘুনাথ অন্যমনস্ক ভাবে সংসারের সুখদুঃখের একটা গভীর সমস্যার বোঝা মাথায় লইয়া অতি কষ্টে মাতৃসমা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালক-হৃদয়ের অন্তস্তলে যে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, তাহা রঘুনাথ ও এক অন্তর্য্যামী ভগবান ব্যতীত আর কাহারও শ্রুতি স্পর্শ করিল না।



বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রামবাহিনী শুদ্ধসলিলা বিপুলাঙ্গী সরস্বতী নিজবক্ষে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের অন্তিম রশ্মির অঞ্জলি লইয়া উদ্দাম তরঙ্গের হাসিতে পতিপদবন্দনায় অনন্ত অমৃতের পথে ছুটিয়াছে। আর সপ্তগ্রামবাসী শত শত নরনারী তাহার পুলিন-পার্শ্বস্থ বৃহদায়তন রাজপথে সেই সতীর পতিভক্তির অক্ষুব্ধ উজ্জ্বল মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে ব্যস্তগতিতে চলিয়াছে। হায়! আজ সেই পবিত্রতীর্থ সপ্তগ্রাম আর সেই প্রত্যক্ষ দেবীরূপিণী সরস্বতী কোথায়!

ইতিহাসতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সপ্তগ্রাম ও সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচিত হইতেছে, কিন্তু যাঁহারা তদ্বিষয়ে অনুরাগী নহেন, তাঁহারা এই অংশটুকু ত্যাগ করিতেও পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে ই,আই রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী যে দীন দরিদ্র অসহায় জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্রস্থান সাতগাঁ গ্রাম নামে অভিহিত, তাহাই একদিন অভ্যুত্থিত রোম ও গ্রীকের ইতিহাসে, বৈভবগরিমায় সৌভাগ্যশালিনী বহুজনাকীর্ণ শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রভূমি, বাঙলার রাজধানী ও ভারতের প্রধান নগরী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পুরাণে ও বিদেশীয় ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে পুরাণে এরূপ লিখিত আছে, — কান্যকুব্জাধিপতি প্রিয়বস্তুর সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন এবং সাতটি ভাই সাতটি গ্রামে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। কালে সেই সাতটী গ্রাম পরিবর্দ্ধিত ও সম্মিলিত হইয়া সপ্তগ্রাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং একটী পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। একদিন এই লুপ্ত সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য দর্শনে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইত ও চক্ষু বিস্তার করিয়া চাহিত। ঢাকার শিল্পকলার চরম নিদর্শন মসলিন বস্ত্র সপ্তগ্রামের বন্দর হইতে রোমে রপ্তানী হইয়া লাবণ্যময়ী বিলাসিনী রোমললনাকুলের অঙ্গলাবণ্য বর্দ্ধন করিত। সমগ্র ইউরোপের বণিক্‌বৃন্দ অতিথির ন্যায় সপ্তগ্রাম বন্দরের সৎকার প্রার্থনা করিত। তাঁহারা সোরা, লাক্ষা, নীল, পান, মসলা, মুক্তাপ্রভৃতি লইয়া যাইতেন। এক্ষণে যে সরস্বতী মুক্তত্রিবেণী হইতে মাত্র স্মৃতিরক্ষাকল্পে সাতগাঁ, ডোমজুড়, ঝাঁপড়দহ, আন্দুলমৌড়ী প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণ শাঁকরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই পূতপ্রবাহিণী চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ কল্লোলে উত্তাল তরঙ্গমালায় তরতর বেগে প্রবাহিত হইত। দেশপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রত্নবিদ্ টলেমি সপ্তগ্রামকে গঙ্গারাঢ় (angarida) এবং এই সরস্বতীকে গাঞ্জেস রিজিয়া (ganges Regia) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, “সে কালে জলপথে আসিতে হইলে ফলতা দিয়া ত্রিবেণীতে আসিতে হইত।

তখন সরস্বতীর মুখ অতি প্রশস্ত ছিল। তাহা দিয়া ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের পথে সুবৃহৎ অর্ণবপোত চলিত। সুতরাং ঐ পথই সংক্ষিপ্ত ও সুগম ছিল।

উইলফোর্ড সাহেব বলেন, পুরাকালে ত্রিবেণী প্রভৃতি শতাধিক গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম নামে কথিত হইত এবং উহা বহু নৃপতির আবাসভূমি ছিল।

হণ্টার সাহেব বলেন, পৌরাণিক যুগ হইতে পর্ত্তুগিজেরা যখন হুগলীসহর পত্তন করেন, তৎকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম পরম্পরাগতভাবে বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। বাঙ্‌লার শেষরাজা লক্ষণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ অধিকার করিলেও রাঢ়ের সমুদায় ভাগ পাঠানাধিকৃত হয় নাই। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কবংশীয় জাফর খাঁর সপ্তগ্রাম আক্রমণ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ সপ্তগ্রামের স্বাধীনতা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যাটক ফ্রেডারিক বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—নানাদেশীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্যের জন্য বহু দূর দেশ হইতে এখানে আসিয়া থাকেন। সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান। ইহার দক্ষিণে বেতড়গ্রাম। ঐ বেতড় হইতে জোয়ারের সময় নৌকা-পথে যাত্রা করিলে অতি অল্প সময়েই এখানে উপস্থিত হওয়া যায়—ইত্যাদি অনেক কথা সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বিবরণে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যাহাই হউক, প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে এককালে সমৃদ্ধিশালী মহানগর ছিল, ইহা যে বাণিজ্যের একটী শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ছিল, এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাপ্রভৃতি মহাদেশের সম্ভ্রান্ত বণিক্গণ যে পণ্যবাহী বিশাল তরী লইয়া এখানে আসিতেন এবং তাঁহাদের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য স্বদেশে লইয়া যাইতেন, আর সপ্তগ্রামতলবাহিনী স্রোতস্বতী সরস্বতী যে বিপুলায়তনা এবং তাহার বিশাল বক্ষে বিভিন্ন দেশের অর্ণবপোতসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট পল্লীর ন্যায় নিত্য অলঙ্কৃত থাকিত, তাহা এই সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক প্লিনি ও ইবন্‌বুটা প্রভৃতি অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এখানে রাজকীয় মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বিদ্যালয়, ধনিগণের সুবিপুল প্রাসাদ, বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের উচ্চচূড় ধর্ম্মোপাসনার মন্দির, সুবিস্তৃত রাজপথ এবং বহুলোকের বাস ছিল। গৌড়ের নবাব এই সপ্তগ্রাম হইতে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা কর গ্রহণ করিতেন। এখানকার বণিক্গণ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিলেন।

প্রাচীন বঙ্গীয় কবি চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণ, মনসাভাসান-প্রণেতা বিপ্রদাস, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি মহাত্মগণের গ্রন্থপাঠে সেই বিশাল নগরের অতীত শ্রী ও গৌরবের

দীপ্তি এখনও প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল কবিতায় অবগত হওয়া যায় যে, এই সপ্তগ্রামে শত্রুজিৎ নামে এক পরম-ধার্ম্মিক হিন্দুনৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বাসভবন অমরা-পুরী তুল্য, তাঁহার যশঃ বিমল চন্দ্রের সদৃশ, তাঁহার প্রতাপ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ছিল।

এই সকল বিবরণ পাঠে আরও জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজলক্ষ্মী ত্যাগের পরেও ন্যূনাধিক একশত বর্ষকাল সপ্তগ্রাম স্ফীতগর্ব্বে স্বাধীন থাকে। তাহার পর ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ গায়সউদ্দীন বুল্‌বনের পৌত্র রুক্‌উদ্দীন্ কৈরস শাহ যখন বঙ্গের মসনদে আরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে জাফর খাঁ বিপুল বিক্রমে অসংখ্য সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্য লইয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। জাফর খাঁর পূর্ণ নাম "বরহাম ইৎসিল।" ইনি বাঙ্‌লায় পনর বৎসর কাল রাজত্ব করেন। শুনা যায়, যেদিন বঙ্গাকাশ হইতে সপ্তগ্রামের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়, যেদিন দুর্ভেদ্য সপ্তগ্রাম-দুর্গে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ইস্‌লাম-পতাকা পতপত শব্দে উড্ডীন হয়, যেদিন জাফর খাঁর সৈন্যদিগের শিবিরে শিবিরে উল্লাসের জয়ধ্বনি আকাশ স্পর্শ করিয়া উত্থিত হয়, যেদিন দুর্দ্দমনীয় পাঠানের বিজয়সঙ্গীত নাগরা সানায়ের সুরে সপ্তগ্রামের রণক্ষেত্র মুখরিত করিয়া তুলে, বাংলার সেই দুর্দ্দৈবের দিনে সপ্তগ্রামবাসিগণের দুর্দ্দশার আর শেষ রহিল না। দুর্দ্ধর্ষ বিজয়োন্মত্ত মুসলমানসৈন্যের প্রবল অত্যাচারের শোচনীয় দৃশ্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি পল্লীতে চিত্রিত হইয়া ছিল। রক্ত-

সিক্ত কর্দ্দমের উপর ধর্ম্মভীরু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধপরিবারসকল হাহাকারে সরস্বতীর বিশাল বক্ষকে সংক্ষুব্ধ করিয়া ছিল। মুহূর্ত্তে যেন যুগান্তের ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়া গেল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সরস্বতীর বক্ষ ক্রমশঃ পলি ও বালুকাপূর্ণ হওয়ায় ইহার পতন আরম্ভ হয়। জলপথে বাণিজ্যের অসুবিধার জন্য এই জীবন্ত বন্দরের ক্রমশঃ আয়ু শেষ হইতে থাকে। তাহার পর দীল্লির সম্রাট্ আকবর পর্ত্তুগীজগণকে হুগলীতে সহর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে তাঁহারা যখন তাঁহার আদেশে সেই সহর নির্ম্মাণ করেন, তখনই সপ্তগ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেই সময় হইতেই ইহার সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। বর্ত্তমানে ত্রিশবিঘা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যে সকল স্থান বৃহদায়তন ও জঙ্গলপূর্ণ, সেই সকল স্থানের ভূমি খনন করিলে এখনও ভগ্ন ইষ্টকাদির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভূপ্রোথিত ইষ্টক অতীত স্মৃতির পূর্ব্বতন কীর্ত্তির এবং সপ্তগ্রাম-সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক। প্রাচীন সরস্বতী-তীরেও ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট ও তাহার সোপানাবলীর বহুচিহ্ন এখনও বহুস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জীর্ণ মসজিদ্ মুসলমানরাজত্বের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব মহাত্মা উদ্ধরণ দত্তেরও এক প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। সেই প্রাচীন মন্দির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিবর্ষে বিভিন্ন স্থানীয় সুবর্ণবণিক্‌গণ তথায় যাইয়া উৎসবাদি করিয়া থাকেন। সেখানে

একটী প্রাচীন মাধবীলতা দেখা যায়। ইহার পূর্ব্ব দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে—আমরা যে বালক রঘুনাথের অমিয় জীবনী সংকলন করিতেছি, সেই শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রাচীন মন্দিরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রবৎ ইষ্টকরাজি অদ্যাপি বর্ত্তমান। জনশ্রুতি, এক্ষণে এই মন্দিরের কিয়দ্দূর পূর্ব্বে যে বিশাল ইষ্টকস্তূপ, তাহাই পুরাতন বাংলার রাজধানী, মৃত সপ্তগ্রাম দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বা জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল। হায় কাল! তুমি কি না করিতে পার? তোমার দৃশ্য মূর্ত্তি সৃষ্টি আর অদৃশ্য মূর্ত্তি প্রলয়! তোমাতে সকলই সম্ভব!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যাস্ত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। দিবা বিষাদের গভীর ছায়া মাখিয়া রাত্রির সহিত সংলাপের ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেদিন শুক্লা নবমী, খণ্ড চন্দ্র নীলকান্তি শনিগ্রহের সমান্তরাল নীলাকাশে থাকিয়া সরস্বতীর স্ফটিকশুভ্র পবিত্র ঊর্ম্মি-দর্পণে নিজ মুখচ্ছবি দেখিতে ব্যস্ত, আর একটী শুভ্র পথহারা বিমল মেঘ চন্দ্র-কান্তির প্রত্যাশী। তাই সে চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে দ্রুতচঞ্চল বেগে প্রাণপণে ছুটিতেছিল। বসন্তের সুখসমীর সরস্বতীর স্নিগ্ধ বক্ষে স্নিগ্ধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সময়ে সরস্বতীর সৈকতশোভী হরিপুরের জমিদার হিরণ্যদাসের ত্রিতল অট্টালিকার ছাদে কয়েকটী মহিলা আসিয়া সমবেত

হইলেন। সমাগত মহিলামণ্ডলীর মধ্যে সকলের বয়স সমান নহে। একটী বর্ষীয়সী, একটী প্রৌঢ়া, একটী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী ও কয়েকটী কিশোরা ও বালিকা। প্রৌঢ়াটি হরিপুরের জমিদার হিরণ্য দাসের সহধর্ম্মিণী, রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাসের জ্যেষ্ঠ সহোদরের পত্নী। যুবতীটী গোবর্দ্ধনের গৃহিণী রঘুনাথের গর্ভধারিণী, বৃদ্ধাটি গোবর্দ্ধনের শ্বশ্রূ রঘুনাথের মাতামহী আর কিশোরী ও বালিকা গুলি হিরণ্য দাসের শ্যালক-কন্যা। সম্প্রতি তাহারা তিন চারি দিন হইল, পিসিমাতার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সকলেই প্রসন্না, সকলেরই হাসি হাসি মুখ, কেবল নয় যুবতীটির। তিনি যেন সেই আনন্দ-হাটের দূর দূরান্তরের পথে একটী মূল্যবান্ পূর্ণস্নেহের ডালি হারাইয়া কাঙালিনীর ন্যায় দণ্ডায়মানা।

ওগো, আজিকার প্রভাতে যে তাঁহার স্নেহের চাঁদ রঘুনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থে চাঁদপুরে চলিয়া গিয়াছে। স্নেহশীলা মাতার হৃদয় যে অতি ভঙ্গপ্রবণ। সে স্নেহক্রটীর একটুকু আঘাতও সহিতে পারে না। সে যে এক মহামিলনযজ্ঞ! সে যজ্ঞের স্নেহোপচার ভিন্ন অন্য উপকরণ প্রয়োজন হয় না। সে মহাসিন্ধুর কূল কিনারা নাই। অপত্যের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্ববেদিনী, তাহার কল্পনা ধ্রুবময়ী সর্ব্বগামিনী। পুত্রবতী রঘুনাথের জননীর নাম বিজয়া। সাধারণে প্রকাশ গোবর্দ্ধন দাসের অঙ্কলক্ষ্মী বিজয়া সতী সাবিত্রী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তিনি সদ্‌বংশজাতা, বহুগুণান্বিতা, মহিমময়ী, দেবদ্বিজগুরুপ্রতি

ভক্তিমতী, পতিপরায়ণা ও সন্তানবৎসলা। শুনা যায়, তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দাসবংশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীরও শুভাগমন হইয়া ছিল।

হিরণ্য দাসের ধর্ম্মপত্নী প্রৌঢ়াটির নাম অলকা। অলকা বন্ধ্যা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাতৃত্বের সর্ব্বস্ব একমাত্র বংশ-দুলাল রঘুনাথকে উৎসর্গ করিয়া আপনাকে সন্তান সন্ততিহীনা দুঃখিনী না ভাবিয়া সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বালক রঘুনাথও তাঁহাকে "বড় মা" বলিতে জ্ঞানহারা হইতেন। এইরূপ সুখ শান্তিতে দাসমহাশয়দিগের সংসার-শ্রী সতত উজ্জ্বল হইয়া থাকিত.

বিজয়াকে ম্লানমুখী ও বিষণ্ণা দেখিয়া অলকা বলিলেন, হাঁ ছোট-বৌ, অতো ভাব্‌ছিস্ কি? সারাদিনটা ছেলের জন্যে হা হুতাশ কর্‌লে আমার রঘুর যে অকল্যাণ হবে।

"আমার পাগল মন যে বোঝে না দিদি" বলিয়া বিজয়া জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

"কি কর্‌বে বোন্! বেটা-ছেলে, ঘরে বসাইয়া রাখিলে ত চলিবে না। বাঁচার সঙ্গে লেখা-পড়া চাই। নৈলে কায়েতের ছেলে কর্‌বে কি? বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা হবে কেমন করে?"

বর্ষীয়সী রঘুনাথের মাতামহী রাঙাদিদিমা অলকার বাক্যের সমর্থন করিয়া কহিলেন, বিজি নিতান্ত ছেলেমানুষ মা, ছেলে কি কারো হয় না! আজ সমস্ত দিনটা কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে তুলেছে দেখ'না! ভ্যালা বাপু, যদি ছেলে ছেড়ে না

থাক্‌তে পার্‌বি, তা হলে ছেলে পাঠালি কেন, যাঁড় ক'র্‌তে ঘরে রেখে দিলেই ত হত' ! আমি নয় জামাইবাবুকে বলিয়া একখানা লাঙ্গলের ফরমাইস্‌ দেওয়াইতাম। ভ্যালা বাপু, অবাক্‌ কর্‌লে !

এই বলিয়া তিনি অলকার ভ্রাতুষ্পুত্রী নাত্‌নীগণকে "আয়লো আয় বিবিরা, গল্প শুন্‌বি ত আয়" আহ্বানে অপরিবর্ত্তনীয়া স্থির-যৌবনা ব্যাংঘুমী ও ব্যাংঘুমার নিখুঁত ভালবাসার মধুর কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাঙালীর সংসারের ঠাকুর'মা আর দিদিমা একটী জাতি-বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে কালেই আবির্ভূত হউন না, চিরদিনই সত্যযুগের সমবয়স্কা সঙ্গিনী। তাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উজ্জ্বলতায় একাল অপেক্ষা সে কালের পক্ষপাতিনী। তাঁহারা একালের উৎকট অন্ধকারে কিছুরই ভাল দেখিতে পান না। সে কালের ফুটালোকে সকলেরই সুন্দরতা স্পষ্ট দেখিতে পান। তাঁহারা বর্ত্তমানের চিত্রে শ্রদ্ধাশীলা নহেন, অতীতের চিত্রে শ্রদ্ধাবতী। তাঁহারা সুচতুরা, সুরসিকা, হাস্য-কৌতুক-সুদক্ষা, রঙ্গরসপ্রিয়া। কিশোর-কিশোরী-তরুণ-তরুণী-সভায় তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ সম্মান ও অখণ্ড গৌরব ! বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এই জাতি ত্রিংশৎবর্ষীয়া যুবতী হইলেও চিরগত-যৌবনা বৃদ্ধা।

হঠাৎ গোবর্দ্ধনের আগমনে রাঙাদিদিমার মুখ বন্ধ হইল। সাধের গল্প থামিয়া গেল। এই আচরণে কিশোরী-বালিকা শ্রোত্রীগণ কিছু বিরক্ত হইল। বিজয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া

ঘোম্‌টা টানিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। অলকা "এস ঠাকুরপো, এস, ছোটবৌকে একটু বুঝাও ভাল করে" বলিয়া সাগ্রহে বিজয়ার রঘুনাথের বিরহে অত্যধিক কাতরতার ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে গোবর্দ্ধনকে বুঝাইয়া দিলেন।

গোবর্দ্ধনও রঘুনাথের বিরহতাপে যে তাপিত ছিলেন না, এমন নহে। তথাপি বিজয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য অলকার দিক্‌ হইয়া বলিলেন, তা বৈ কি বৌঠাকুরুন! ছেলেকে প্রকৃত ভালবাস্‌তে হ'লে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলনাশী এরূপ ভালবাসা কিছুতেই শুভকর নয়।

গোবর্দ্ধনের এই কথাগুলি পুত্রবিরহকাতরা বিজয়ার মনঃপূত হইল না। তাই তিনি বিহ্বলভাবে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ক্রমে সঙ্কুচিতা দিদিমা উঠিলেন। তখন বালিকাগুলি আরও অসন্তুষ্ট হইয়া দিদিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ নিম্নসোপানাভিমুখিনী হইল। স্নেহের কণ্ঠে অলকা দেবরকে বলিলেন, ছুঁড়ি সমস্ত দিন জলগণ্ডূষ কাটেনি, আমি বুঝাইয়া কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি বলিয়া যদি কিছু খাওয়াইতে পার, দেখ'ত ভাই।

গোবর্দ্ধন নত-মস্তকে পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর আজ্ঞা-পালনে দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন।

নারী অলকার মাতৃ হৃদয়ও রঘুনাথের স্নেহমমতায় আর্দ্র হইয়াছিল। কেবল স্নেহাকুলা বাৎসল্যময়ী বিজয়ার চাঞ্চল্য-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি হৃদয়ের অন্তরালে প্রাণের ব্যথা লুকাইয়া

প্রকৃত গৃহিণীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্জ্জন পাইয়া সোপানস্তরে নামিতে নামিতে বিজয়ার উদ্দেশে অস্পষ্ট-মৃদুস্বরে একবার নয়—বহুবার বলিলেন, কাতর হবে বৈ কি, হাজার হোক্ মায়ের প্রাণ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি বিজয়া পতি-দেবতার আজ্ঞায় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া থাকিলেন। অন্নাহার করিলেন না। সমস্ত দিনের পর অন্নাহার কুপিতাহার বলিয়া স্বাস্থ্য-বিধির নিষিদ্ধ। তাই গোবর্দ্ধনও বিজয়াকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন না। বিজয়া কক্ষে আসিলে কেবল বলিলেন, এমন করিয়া উপবাসে কয়দিন কাটাইবে?

বিষাদিতা বিজয়া কোন একটী উত্তর না দিয়া মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যেন সেই নিশ্বাস-বায়ু রঘুনাথের নিকট তড়িদ্বেগে ছুটিয়া গেল। বালক রঘুনাথ তখনই স্বপ্নে দেবীরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে ঘুমের ঘোরে বাহু প্রসারণে বলিয়া উঠিলেন "মা—মা—মা!"

আচার্য্যগৃহিণী রঘুনাথের বামুনদিদি অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "কি ভাই রঘু, মাকে স্বপ্নে দেখিতেছ?"

বিজয়ার কোন উত্তর না পাইয়া পুনঃ গোবর্দ্ধন বলিলেন, কি, কথা কইলে না যে ?

"কি আর বলিব, খাইতেই হইবে, না খাইয়া মানুষে আর কয়দিন বাঁচিতে পারে ?"

"তবে শরীর নষ্ট করিতেছ কেন ?"

"মায়ের পোড়া মন বোঝে না। মা যে রাক্ষসী, সর্ব্বদাই সন্তানের শুভ গ্রাস করিয়া অশুভটাই টানিয়া আনে।"

"কি করিবে, এখন ছেলেকে ভালবাসিয়া কাছে রাখিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইবে না। মুর্খ পুত্র কি করিতে চাও ?"

বিজয়া সচকিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না না মূর্খপুত্র যমসম, আমি কি তাহাই বলিতেছি ?"

"তবে মার প্রাণে দোষারোপ করিতেছিলে কেন ?"

"ঐ ত মার অপরাধ।"

"কিসে ? বুঝিলাম না।"

"মাতৃপ্রাণ সন্তানের অদর্শনে সহস্র সান্ত্বনায় প্রবোধ মানে না। তখন তাহাকে সহস্র উপদেশে বুঝাইলেও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে তখন কাহারও কথা শুনিতেও ভাল-বাসে না। সে তখন বধির, সে তখন অন্ধ। সে তখন আপন প্রাণে যাহা বুঝে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে।"

তখনও প্রতিমুহূর্ত্তে রঘুনাথের মাতৃ-মনোমোহন মূর্ত্তি মাতা বিজয়ার হৃদয়ে জাগরূক্ ছিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া গোবর্দ্ধন শয্যায় শয়ন

করিলেন। বিজয়া পতি-পদতলে বসিয়া পতি-দেবতার পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে নীরবে অতিবাহিত হইল। সমস্ত দিবস বৈষয়িক-শ্রমশ্রান্ত গোবর্দ্ধন শয্যা-প্রাপ্তিমাত্রই তন্দ্রিত হইলেন, কিন্তু পুত্রপ্রাণা বিজয়ার পোড়া চোখে আদৌ নিদ্রা আসিতেছিল না। প্রকৃতি নিশাসহ মিলনে যত নীরব হইতেছিল, তত গুরু-গৃহগত রঘুনাথের চিন্তা বলবতী হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিতেছিল। "আহা আমি কি পাষাণী! অট্টালিকায় স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছি, আর বাছা আমার গুরু-গৃহের পর্ণকুটিরে পড়িয়া রহিয়াছে! তৃণ-শয্যায় শুইয়াছে। কঠিন উপাধানে মস্তক রাখিয়াছে! পুত্রের এ সংযম-শিক্ষার কঠোর সাধনা কি মায়ের প্রাণ সহিতে পারে? কে তাহাকে দেখিতেছে? গুরুপত্নী? তিনি ত পুত্রবতী নহেন, পুত্র-স্নেহ কেমন করিয়া বুঝিবেন? হায় নারী-জীবন কি পরাধীন! নারী-হৃদয় কি দুর্ব্বল! এমন নারীর গর্ভসঞ্চার হয় কেন? সন্তানই বা হয় কেন? যদি সন্তানদানই ভগবানের অভীপ্সিত, তাহা হইলে সে দুর্ব্বল নারী-হৃদয়ে এরূপ স্নেহের রস কেন প্রদত্ত হইল? কোন্ নির্ম্মম এ দারুণ বিধান প্রদান করিল? সকলেই একবাক্যে বলিবে, তিনিই, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, বিশ্বের নিয়ন্তা! ভালই, ইহাতে তাঁহার কি উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে? জানি না।" এই সকল ভাবনা ও তর্কের অনন্ত তরঙ্গ বিজয়ার স্নেহপূরিত মাতৃ-হৃদয়-সমুদ্রে সারারাত্রিই ভাসিতে ছিল, খেলিতে ছিল, দুলিতে ছিল,

নাচিতে ছিল, তাহাকে তোলপাড় করিতে ছিল। ক্রমে দেখা গেল, গভীর আবেশে তাঁহার ভাবনা ও তর্ক মন হইতে সরিয়া গিয়াছে। তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতির পদপ্রান্তে শায়িত হইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তন্দ্রিতা বিজয়া স্বপ্নে দেখিলেন, কে একজন চীরকৌপীন-কন্থা-ভস্ম-জটাজূটধারী স্মিতানন জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া। লক্ষ লক্ষ লোকে সেই সন্ন্যাসীকে পরিবেষ্টন করিয়া অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। কেহ বা স্তুতি করিতেছে, কেহ বা বাঞ্ছিত আশীর্ব্বাদ চাহিতেছে, কেহ বা অলৌকিক তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসীর অসাধারণ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অযাচিত প্রশংসাবাদ করিতেছে। সংযত নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্, স্থির ও নিশ্চল। কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তন্ময়! দেখিতে দেখিতে বিজয়ার অমরাবতীতুল্য রত্নপ্রভ-প্রাসাদ অন্ধকার কূপে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। দাস, দাসী, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, বৈভব, সকলই বাতক্ষুব্ধ কর্পূরের মত অদৃশ্য হইল। বিজয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুক গুরু গুরু করিয়া চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। তিনি আতঙ্কে উঠিয়া অধোবদনে বসিলেন। অশ্রুধারা অলক্ষ্যে গোবর্দ্ধনের বামপদ অভিষিক্ত করিল। গোবর্দ্ধন শিহরিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে জড়িতস্বরে বলিলেন, "এঁকি ছোট বৌ, তুমি এখনও শোও নাই? বসে বসে কাঁদ্‌ছ?

ভোরের পাখী সবুজ পাতায় ঢাকা গাছের ডালে বসিয়া

প্রাভাতিক সংবাদপত্রের ন্যায় নৈশ-সংবাদ পল্লিবাসীদিগকে জানাইতে তাহাদের জাতীয়-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্তাদি ষড়্ঋতুর পর্য্যায়নেমী দেখিতে দেখিতে মানব-ভাগ্যের সুখ-দুঃখের পথে অলক্ষ্যে দুইবার ঘুরিয়া কত চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহার মধ্যে কত সৃষ্টি-প্রলয় ঘটিল, কত ইন্দ্রপাত হইল, কত ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিল, কত ফুল ফুটিল, কত শুকাইল; সেই সঙ্গে বালক রঘুনাথেরও গুরু-গৃহে হিতোপদেশ পাঠ শেষ হইয়া ভট্টি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়াছে।, সুশীল রঘুর লেখাপড়ায় বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল। প্রতিভার ষোলকলাপূর্ণ বালকের যাহা সাধারণের এক মাসের শিক্ষণীয় তাহা শিখিতে এক সপ্তাহের অধিক প্রয়োজন হইত না। সদা গুরু আজ্ঞাকারী রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই গুরুর সকল আচার ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়া ছিলেন। সেই প্রাতঃস্নান, সেই চন্দন-তিলক ধারণ, সেই ভোগ-বিলাস ত্যাগ প্রভৃতি গুরু-কৃত কার্য্যের অধিকাংশরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে আত্যন্তিক অনুরাগ-বীজ তাঁহার হৃদয়ে সেই সময় হইতেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। তিনি হরিপুরের ইন্দ্রপুরীসদৃশ বাস-ভবন

অপেক্ষা চাঁদপুরের গুরুর পর্ণকুটিরকে অতি প্রীতিপ্রদ স্থান বলিয়া মনে করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুসঙ্গ-লিপ্সা এত বলবতী হইল যে, পরিশেষে অমৃতময় মাতৃ-সান্নিধ্যের অভাবও ক্লেশকর বোধ হইত না। সর্ব্বদাই গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চ্চা ও সৎপ্রসঙ্গ লইয়া কালাতিপাত করিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমে বসন-ভূষণ-ভোগ-সুখ সকলই তাঁহার তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। বিষয়ত্যাগী কোন মহাপুরুষ বা সাধুর প্রসঙ্গ ও তাঁহার জীবন-চরিত শুনিতে তিনি অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার পুণ্যময় জীবনী শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন; ভাবিতেন, সাধু-জীবনই জগতে পরম ধন্য। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না পাইলে কেহই সেই অমূল্য ক্লান্তিহীন শান্তিময় জীবন লাভ করিতে পারে না। এই সকল বিষয় অনুশীলন করিতে করিতে রঘুনাথ আকুল হইয়া কাঁদিতেন। কখন বা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে করযোড়ে ঊর্দ্ধ নয়নে ভগবানের উদ্দেশে বলিতেন, "হে কল্যাণময় বিভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি অতি অধম, আমার কোন শক্তি নাই। পিতামাতার নিকট দুর্ব্বল শিশু চির আদরের, অতি স্নেহের। হে সর্ব্বশক্তিমান্ দয়ালু পিতা, আমি তোমার দুর্ব্বল শিশু-সন্তান। আমার প্রতি স্নেহ-কণা বিতরণ কর। আমায় সংসার হইতে দূরে লও। তোমার অমৃত জ্যোতির রেখাকণা দেখিতে দাও। আমি আরাধনা জানি না, উপাসনা বুঝি না, অন্তস্তত্ত্ব দেখিবারও আমার দর্শন নাই। দৃষ্টি-দানে অন্ধকে

কৃপা কর।" সময় সুযোগ পাইলেই ভগবানের নিকট রঘুনাথের এই বিনীত প্রার্থনা ছিল।

রঘুনাথ একদিন শুনিলেন, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীনিমাই গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন! তাঁহার স্নেহময়ী একপুত্রা মাতা, রূপসৌন্দর্য্যময়ী প্রণয়িনী যুবতী ভার্য্যা, প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজন ও সুহৃৎ কেহই তাঁহাকে মায়াময় সংসারে স্নেহ বা প্রেম-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। এমনি তাঁহার বিষয়ে অনাসক্তি, এমনি তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য! তাহাতে সাংসারিক-বাৎসল্যের সুমেরু টলায়, প্রেমের বন্যা শুকায়, সখ্যের দীপ্তি নিবায়, তাই সে শ্রীনিমাই সংসার-জয়ী। শ্রীনিমাইএর সেই কাহিনী শুনিয়াই রঘুনাথের চিত্তের চিন্তাধারা সেই দিকে ছুটিল। কোথা হইতে কোন্ আবেগময়ী কল্পনা আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন-লালসায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কি জানি, এ আবার কোন অদৃশ্য আকর্ষণ! আমরি মরি! বল বল রঘুনাথ! বর্ত্তমান যুগ-বিপ্লবের দুর্দ্দিনে জীবের দুঃখে দয়া-পরবশ হইয়া আপন অনুভূতি লইয়া বল, শুনিবার বড় ইচ্ছা—বল বল মহাপ্রাণ, এ অনুরাগ-লক্ষণের নাম কি? আর ঐ সঙ্গে আরও একটী কথা বুঝাইয়া বল—এ অনুরাগের জন্ম কোন্ পুণ্যে!

আর একদিনের কথা—অধ্যাপক বলরাম আচার্য্যের সম্মুখে রঘুনাথ পাঠোপবিষ্ট! গুরু-ছাত্রে কথোপকথন হইতে ছিল।

গুরু। তোমার ভোগ-বিলাসে অনুরাগ নাই দেখিয়া মা বিশেষ দুঃখিত, নয় রঘুনাথ ?

রঘু। বিশেষ দুঃখিত।

গুরু। কেন তুমি মাতৃ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক ?

রঘু। তিনি যাহা চান, আমার হৃদয় তাহা চায় না।

গুরু। কেন ?

রঘু। আমার বিবেক তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধা প্রদান করে।

গুরু। তোমার বিবেক তোমায় কি উপদেশ দান করে ?

রঘু। আমার মনে হয়, ভোগ-বিলাসেই অভাবের সৃষ্টি ! অভাবেই লালসা আনয়ন করে। তখনই আমার শ্রীমদ্ বিষ্ণু-শর্ম্মার হিতোপদেশের "লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি" সেই সারবান্ শ্লোকটী মনে পড়ে।

গুরু। বুঝিলাম, তাহাই সত্য, কিন্তু, একদিকে মাতৃ-প্রাণের অপ্রসন্নতা, অন্যদিকে তোমার বিবেক-পরিচালিত ইচ্ছা, কাহার পদে মাল্য-চন্দন দান করিবে ? কাহার জয় দিবে ?

রঘু। বিবেকের জয়ই বাঞ্ছনীয়। বিবেকের শক্তি-বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষা। নতুবা ছাই ভস্ম বিদ্যালোচনার ফল কি ?

গুরু। মাতৃমনস্তুষ্টিও ত সন্তানের ধর্ম্ম।

রঘু। ইহাও বিবেকের নীতি-উপদেশ। বিবেক ইহাই সন্তানকে শিক্ষা দিয়াছে।

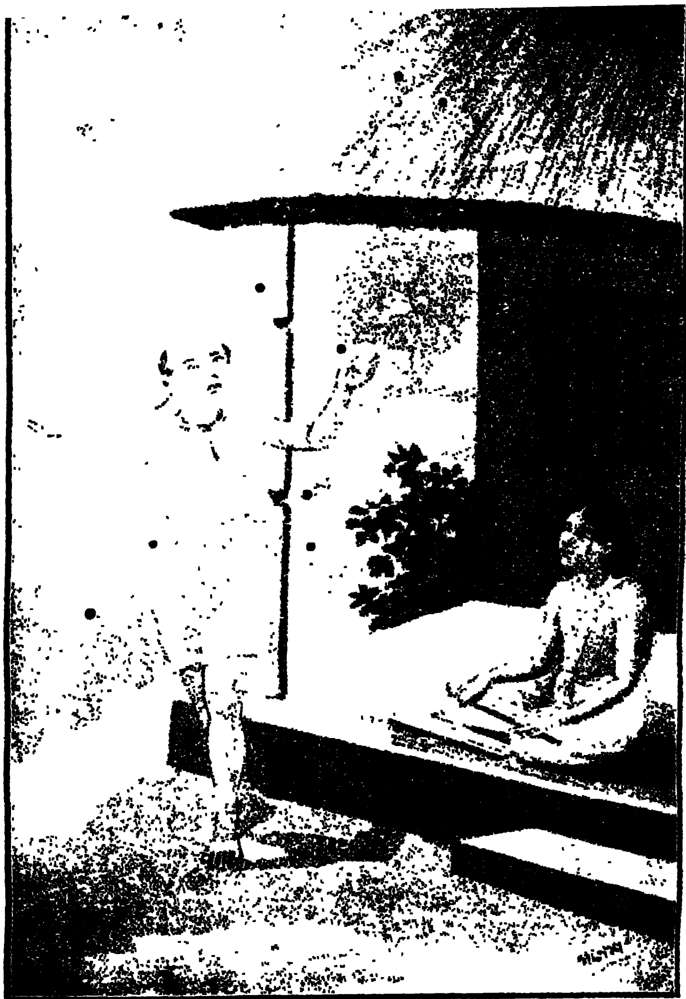
গুরু। নিশ্চয়।

রঘু। তা হইলে বিবেকের জয়ই অতি নিশ্চিত।

আচার্য্য সস্নেহে রঘুনাথের মুখচুম্বন করিলেন।

তখন এক প্রহরের অধিক বেলা। হঠাৎ পল্লীর অশান্ত বালকের পাল চেঁচাইয়া উঠিল, "ওরে দেখ্ দেখ্—একটা পাগ্‌লা এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে একপাল বালক ধূলি-মাটি ছুড়িতে ছুড়িতে এক ছিন্ন-মলিন-বসনধারী রুক্ষদেহ চিন্তা-পীড়িত অনিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন মার্ত্তণ্ডসম প্রৌঢ়কে ঘেরিয়া আচার্য্যঠাকুরের বাহির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রৌঢ়-ব্যক্তিটি ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধনেত্র ও হরিনামোন্মত্ত! বাহ্যজ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না; কেন না তিনি বালকগণের নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতেও অবিকৃত ও সহাস্য। কৌতুকবিভোর বালকগণও প্রথমতঃ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ছিল, পরে যখন দেখিল, অদূর-সম্মুখস্থ কুটীর-বেদির পাঠনাসনে গম্ভীরতার স্থিরমূর্ত্তি আচার্য্য ঠাকুর উপবিষ্ট, তখন তাহারা স্ব স্ব বাচালতা ত্যাগ করিয়া সভয়ে যে যে দিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। ছুটিবার দৌরাত্ম্যে কেহ পড়িল, কেহ উঠিল, আবার ছুটিল, আবার পড়িল, এইরূপ পড়িতে উঠিতে, উঠিতে পড়িতে কাহারও হাঁটু ছিঁড়িয়া রক্ত ঝরিল, কাহারও বা পদে দারুণ আঘাত লাগিল। তথাপি সকলেই—কেহ বা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেহ বা ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে আচার্য্যঠাকুরের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইল।

হায়রে বাল্য-দশা! তাঁহা স্মরণে এই বৃদ্ধ গ্রন্থকারেরও



হরিদাস ও পাঠোপবিষ্ট রঘুনাথ

দুঃখ হয় আর হাসিও আসে। বর্ত্তমান সময়ে অতীত বাল্যস্মৃতি আনন্দের বিনিময়ে লজ্জা আনিয়া অনুতপ্ত করে।

আচার্য্যঠাকুর অশোক ফুলের স্তবকের মত লাবণ্যময় সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই চিনিলেন—পঙ্কের পদ্ম বটে, আদরে গৃহে রাখিলে দেবপূজার যোগ্য উপহার। দীন আগন্তুকও আচার্য্যঠাকুরকে দেখিয়াই "আমার বাঞ্ছিত আশ্রয়ই ইনি" বলিয়া চিনিলেন। চারি চক্ষুর মিলনেই উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। আগন্তুক প্রণত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বড়ই বিপন্ন, কৃপা ও আশ্রয়-প্রার্থী।

"ভগবানের বিচিত্র লীলা, একের বিপদে অন্যের সৌভাগ্য সঞ্চার! উত্তম, বাসনানুরূপ কালাতিপাত করিয়া দীনের আশ্রম পবিত্র করুন।"

নতমস্তক আগন্তুক তাঁহার সম্মতি জানাইলে আচার্য্যঠাকুর শশব্যস্তে একখানি কৃষ্ণাজিন দিয়া তদুপরি বসিতে অনুমতিপ্রদান করিলেন। আগন্তুক আসনোপবিষ্ট না হইয়া তাঁহার সমুদায় শ্রমসফলতার জয়স্বরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, জয় শ্রীহরি! তোমার করুণার অন্ত নাই।"

ইহার পরেই আচার্য্যঠাকুর আতিথ্য-সৎকারোদ্‌যোগে চলিয়া যাইলেন। তথায় আর কেহই রহিল না, কেবল রঘুনাথ পাঠ্য-গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অনন্ত অসীম সংসার-সিন্ধুর সফেনতরঙ্গায়িত নীল জলের পরপারে একটী শুভ্রোজ্জ্বল বিস্তৃত সিকতাময় তটভূমি দেখিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক অতিথির নাম যবন হরিদাস। বাস শান্তিপুরের নিকট বুড়ন গ্রাম। ইনি জাতিতে যবন হইয়াও হিন্দুর উপাসিত হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। হরিদাস হরিনামরসে বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিত। হরিদাস হিন্দু-মুসলমান উভয়-ধর্ম্মীরই বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া হিন্দুর উপাস্য হরিকে উপাসনা করিতেছেন, ইহা কোন্ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর সহনীয়? আবার মুসলমান হিন্দুর ঠাকুর ভজিয়া হিন্দুর সহিত মিশিবে, ইহা কোন্ হিন্দুর স্পৃহণীয়? সুতরাং উভয়জাতিই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ্টা হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমানগণ একেবারে খড়গহস্ত হইলেন। কেন না যে জাতি বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক তাহাকেই পরম পুণ্যময় কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী হইয়াছে দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রথমতঃ তাঁহারা তাঁহাকে স্বধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, এত উগ্র ঔষধেও রোগীর বিকার কাটিল না এবং আর কোনরূপেই কিছুতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন স্থানীয় কাজির সহযোগে মুলুকপতি হোসেন শাহের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে এক বিষম অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। বিচারে হরিদাসের

বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। হরিদাস বন্দী হইলেন। বাইশ বাজারের প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সেই নৃশংসাভিনয়ের রঙ্গভূমির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে লক্ষ লক্ষ দর্শক আসিয়া সমবেত হইল! অদ্ভুত জনতা ও অদ্ভুত ভিড়!

হায় মানুষ! তুমি মানুষ হইয়া মানুষের মৃত্যুর বাঞ্ছা কর? জানি না, এই মানুষে ও অন্য জীবে বিভিন্নতা কত?

যথা-সময়ে বন্দী হরিদাস যথাস্থানে আনীত হইলেন। সর্ব্ব-জন-সমক্ষে প্রাণান্তকর নিদারুণ বেত্রাঘাত চলিতে লাগিল। সর্ব্ব-দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল। সর্ব্বাঙ্গে শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। কিছু মাত্র সংজ্ঞা রহিল না। বোধ হইতে লাগিল, যেন হতচৈতন্য হরিদাস্ এবার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার করাল কর হইতে মুক্তি গ্রহণ করিয়া চির শান্তি লাভ করিতেছেন। রাজকীয় পুরুষগণ হরিদাসের নিশ্চিত মৃত্যু বুঝিয়া কাজি সাহেবের নিকট সংবাদ দিলেন। কাজি সাহেব আদেশ করিলেন, হরি-দাসের শবদেহ কবর না দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হউক। তাহাই হইল। হরিদাস চলোর্ম্মি গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন।

ধন্য সাধক! ধন্য তোমার সাধনা!

যে সাধনায় পৌরাণিক-যুগের হরিভক্ত প্রহ্লাদ হস্তিপদ-তলে, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গ হইতে ভূতল পতনে, বিষভক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন, সেই সাধনায় যবন হরিদাসও মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সমগ্র দর্শককে স্তম্ভিত

করিয়াছিলেন। সাধনাসিদ্ধ হরিদাস গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন। তাহা হইলেই বা কি হয়, ইহার পরেও তিনি এক দুর্বৃত্ত জমিদারের দুর্ব্বিসহ অত্যাচারে বিশেষ নিগৃহীত হন। তাই বহু ভাবিয়া হরিদাস সেই প্রতিকূল-স্রোতের মুক্তিবাসনায় ও নির্ব্বিঘ্নে ইষ্টসাধনা করিবার অভিপ্রায়ে বলরাম আচার্য্যের আশ্রয়াধীন হইয়াছেন। হরিদাসের আশা পূর্ণ হইল। তিনি সেই দিন হইতে আচার্য্যঠাকুরের আশ্রয়-দুর্গে নির্ব্বিঘ্নে পরমানন্দে হরিনাম সাধনা করিতে লাগিলেন।

এস্থলে স্বতঃই মনে একটী প্রশ্ন উদয় হয় যে, বাংলার এত লোক থাকিতে হরিদাস কেন নিঃস্ব ব্রাহ্মণের আশ্রয়াধীন হইতে আসিলেন? তদুত্তরে জানা যায় আচার্য্যঠাকুর আর্থিক-সম্পদে চির-দরিদ্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মণ্যপ্রতাপ-সম্মান তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালী পরাক্রান্ত রাজরাজেশ্বরের রত্নসিংহাসন অপেক্ষা উচ্চাসন দান করিয়াছিল। তাঁহাকে কেহ ভয় করিত না বটে, কিন্তু সকলেই নির্ভয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার নির্ম্মল অর্ঘে পূজা করিত। দুষ্টেরা তাঁহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁপিত, শিষ্টেরা পরম প্রীতি লাভ করিত। আচার্য্যঠাকুর বিপন্নের সুহৃৎ, দীনহীনের বন্ধু, সৎকার্য্যের সহায়, সঙ্কটের মন্ত্রী, বেদনাতুরের সান্ত্বনা ও অনাথের পিতৃস্বরূপ হইয়া সপ্তগ্রাম-সমাজবেদির আরাধ্য বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতে ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে বা উপদেশানুসারে যে থাকিত বা চলিত, সকলেই তাঁহাকে আচার্য্যঠাকুরের ন্যায় সম্মান করিত। ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ

ছল না। কেন না তিনি হিন্দু-মুসলমান যে কোন জাতি হউক না, সকলকেই সমচক্ষে দেখিতেন।

এদিকে হরিদাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে ঘৃত-সংযোগের ন্যায় রঘুনাথেরও প্রকৃতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। তিনি যেন একাদশ বৃহস্পতি-দশার অনুগ্রহ পাইলেন। তাঁহার ঈপ্সিত নিধি গৃহেই মিলিল। রঘুনাথ হরিদাসের নাম গানে এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার আর পড়াশুনা আদৌ ভাল লাগিল না। ক্রমে তিনি অধ্যয়ন-ব্রত ভঙ্গ করিয়া কায়মনঃপ্রাণে হরিদাসের সেবা-শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। এমন কি আচার্য্যঠাকুর নিকটে না থাকিলে হরিদাসের সহিত হরি-নামগানে যোগদান করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই রঘুনাথ ভোগ-বিলাস-পথের দূরযাত্রী ছিলেন, এক্ষণে হইলেন কি—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদায় সুখের বস্তু ত্যাগী। তাহাতে বামুনদিদি শ্রীমতী কামাখ্যা-দেবী অনেক আপত্তি করেন, কিন্তু রঘুনাথ দেবী-প্রতিমা করুণার সম্রাজ্ঞী বামুনদিদির পায়ে ধরিয়া তাঁহার সকল আপত্তিরই খণ্ডন করিয়া ল'ন। দিনে দিনে উৎকট বৈরাগ্য তাঁহাকে পিচ্ছিল সংসার-ক্ষেত্রের দূরে লইতে ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যুতিক-বার্ত্তার ন্যায় এই সকল সংবাদ পিতা গোবর্দ্ধন দাসের শুনিতে বিলম্ব হইল না। গোবর্দ্ধন দাসের জ্যেষ্ঠ হিরণ্য দাস, রঘুনাথের মাতা, আত্মীয় ও স্বজন সকলেই শুনিলেন। শুনিয়া সকলেই ভাবী-বজ্রপাতভীত, ম্রিয়মাণ ও উদ্বিগ্ন হইলেন। সকলেরই যবন হরিদাসের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল। বৃদ্ধ হিরণ্য দাস মেঘগর্জ্জন-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বেটা নেড়ের টিকি ছিঁড়িয়া আন্।" অবশ্য কার্য্যে তাহা পরিণত হয় নাই, সে গর্জ্জন শারদীয় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিল না। সাশ্রুচক্ষু গোবর্দ্ধন, নম্রস্বরে কহিলেন, এখন দাদা উপায় কি?

"উপায় আর কি? অগ্রে আমায় ঘটি-কম্বল দাও আমি বিদায় হই, তার পর তোমরা যাহা ইচ্ছা কর। আমার আবার এ বন্ধন কেন? যে সংসারে পুত্র-কন্যায় বঞ্চিত, তাহার প্রতি মহা-মায়ার এ বিড়ম্বনা কেন? কে বলিল, সংসারে কাহারও কুমাতা হয় না? হায় মাগো মহামায়া"—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মুছিলেন। দেখা গেল, তাঁহার রক্ত চক্ষের কোণে আরও উষ্ণ অশ্রু প্রস্রবণের ন্যায় প্রস্রুত হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে হিরণ্য আবার কহিলেন, উপায় আর কি? কে সাহস করিয়া আচার্য্যরক্ষিত

হরিদাসের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারিবে? সেই বেটাই সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং করিবে, কাহারও কিছুই বলিবার পন্থা নাই।

ভয়াকুল গোবৰ্দ্ধন দীনভাবে জ্যেষ্ঠের পদে নিবেদন করিলেন, "ঠাকুরকে কি বলা চলিবে না, আপনি হরিদাসকে স্থানান্তরিত করুন বা রঘুনাথকে কোনরূপে আমাদের বাটীতে রাখুন। নতুবা আমরা ভবিষ্য-দর্শনে বড় ভীত হইয়াছি। রঘু যে আমাদের বংশের একমাত্র প্রদীপ! সে প্রদীপ হারাইলে আমরা যাইব কোথায়?" মৰ্ম্মান্তিক পীড়িত গোবৰ্দ্ধন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে পল্লীর মাধব যাদব, উদ্ধব, কৃষ্ণরাম, ঘনশ্যাম, অভিরাম, দাঠাকুর ও চন্দ্রকাকা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া সমবেত হইলেন। তখনও গোবৰ্দ্ধন বিবশ ও বিহ্বল ভাবে রোদন করিতেছিলেন!

রোদন দেখিয়া চন্দ্রকাকা বলিলেন, গোবৰ্দ্ধন কাঁদিও না বাবা, রঘুনাথ আমাদের অমূল্য রত্ন। সে কখন পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করিবে না।

দাঠাকুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নাসিকাসংলগ্ন ওষ্ঠে তোৎলা স্বরে কহিলেন, প-দার্থ-টা-কি?—রোদন—কিসের—জন্য? উদ্ধব স্পষ্টবক্তা, স্বভাবের দোষে সে উচিত কথা কহিয়া স্থানে স্থানে লাঞ্ছিত হইত, আবার স্থানে স্থানে বা অযাচিত প্রশংসা-বাদ লাভ করিত। সে দাঠাকুর-ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না—বলিল, পদার্থ-টা-কি—দাঠাকুর, অপর—কিছুই—নহে, পৃথিবীটা—গোলাকার—কিনা, তাই

তার সর্ব্বস্থানেই—গোলযোগ-ব্যাপার। তাতেই সব গোল হচ্চে।

দাঠাকুর অন্য ক্ষেত্র হইলে উদ্ধবকে কিছু শিক্ষা না দিয়া সহজে ছাড়িতেন না, কিন্তু এ ক্ষেত্র তাহা নহে; কেননা ইহা তাঁহার জামাতার মনিব-বাটী! তাহার উপর আবার সে ক্ষেত্রে বিষাদ-পর্ব্বের অভিনয়। সুতরাং দাঠাকুর একবার এরূপ কুটিল ভ্রূভঙ্গে উদ্ধবের দিকে চাহিলেন যে, উদ্ধব উচিত কথা কহিতে কাহাকেও ভয় করিত না বলিয়াই অটল রহিল। যাহাই হউক, অনেকের উপস্থিতিতে নানাবিধ কথার পর পরামর্শ স্থির হইল, "রঘুনাথের যখন ঠাকুরের আশ্রমই প্রিয়, তখন ঠাকুরকে অনুনয়-বিনয় করিয়া কোন রূপে হরিদাসকে তাঁহার আশ্রম হইতে স্থানান্তরিত করাই নির্ব্বিরোধ ও নিরাপদ।"

যে কথা, সেই কাজ, হিরণ্য দাসের আদেশে তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিত হইল এবং আচার্য্যঠাকুরকে হরিপুরে আনিবার জন্য সেই পত্র লইয়া পত্রবাহক চাঁদপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। সেদিনের সংবাদ এই পর্য্যন্ত।



যথা সময়ে আচার্য্যঠাকুর পত্র পাইলেন। লিপি-ভঙ্গী দেখিয়া তিনি স্বগৃহে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। কেননা তিনি যে পুরোহিত! যজমান বিপন্ন! এ বিপদ ত যজমানের নহে, তাঁহার নিজের। ঠাকুর পত্রবাহকসঙ্গেই যাত্রা করিয়া হরিপুরে দাসমহাশয়ের ভবন পবিত্র করিলেন। হিরণ্য ও

গোবর্দ্ধন ঠাকুরকে যথাবিহিত আসন দান করিয়া ভক্তিনম্র-প্রাণে নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। প্রতিভাদীপ্ত কমনীয়-মূর্ত্তি ঠাকুর যজমানদ্বয়কে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া ধীরস্বরে কহিলেন, কিসের জন্য এরূপ অসময়ে ব্যস্তভাবে আমায় আহ্বান হিরণ্য ?

হিরণ্য কি বলিবেন প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেন না প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া বলাটা তাঁহার প্রকৃতির চির-বিরুদ্ধ। এখন হিরণ্যের হৃদয়ে অকূল চিন্তা-সমুদ্র! ভয়, হটকারিতা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থ তাহার সফেন উত্তাল-তরঙ্গ, পরস্পর সংঘর্ষে প্রবল বেগে চলিতেছে, তিনি ধৈর্য্য হারাইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত, কপালের শিরাসমূহ স্ফীত, কণ্ঠ বিশুষ্ক ও মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল। গলদঘর্ম্মশরীরে হিরণ্য কিঞ্চিৎ শান্তি লাভের জন্য যেন ভূ-বিদারণের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী আচার্য্যঠাকুর যজমানের অবস্থা দেখিয়া সকলই বুঝিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ করুণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে অভয় দিয়া বলিলেন, হিবণ্য আমার নিকট আত্মগোপন করিও না, প্রকৃত কথা কি বল ? আমি অসন্তুষ্ট হইব না।

ঠাকুরের সান্ত্বনা-বাক্যে সত্যবৎসল হিরণ্য হাতে আকাশ পাইলেন। মরা-গাছে নূতন পাতা গজাইল। নিদাঘের শুষ্ক সরসীর কুমুদ প্রাবৃটের বৃষ্টি সমাগমে প্রফুল্ল হইল। হিরণ্য নম্রস্বরে কহিলেন. ঠাকুর, রঘুনাথকে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছি।

আচার্য্যঠাকুর রঘুনাথের সকল অবস্থারই সংবাদ জানিতেন। হিরণ্য দাসের স্ফুরিত সংক্ষিপ্ত বাক্যে সকলই বুঝিয়া লইয়া মাত্র কহিলেন, কি করিবে, মদমত্ত-গজগতি কি রোধ করিতে পারিবে? সমুদ্রমুখী নদকে বাঁধে বাঁধিয়া রাখা যায় কি?

কথা শুনিয়াই হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন শিহরিয়া উঠিলেন। আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন উভয়ের মস্তকে পড়িল। হিরণ্য কাতর ভাবে বলিলেন, প্রভু, তবে কি স্নেহের রঘু আমাদের ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে? তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য-বিভব কিসের জন্য?

হিরণ্য বস্ত্রে চক্ষু আবৃত করিলেন। গোবর্দ্ধনও বিষণ্ণ ও বিবর্ণ। মুখে কোনও কথা নাই—নির্ব্বাক্ ও সজলচক্ষু!

সহসা পশ্চাৎ গবাক্ষ-পার্শ্ব হইতে অতি মৃদু করুণস্বর সমীর-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই শব্দে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন স্পষ্ট বুঝিয়া লইলেন, "এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা।" কিন্তু মোহিনী-মায়ার চাতুর্য্যে কে তাহা বুঝিতেছে? তুচ্ছ ত হিরণ্য-গোবর্দ্ধন!

কিছুক্ষণ দুই ভ্রাতায় নীরব হইয়া থাকিলেন, তাঁহাদের চক্ষু-চতুষ্টয় ভবিষ্যবেদনায় ছল ছল করিতে ছিল!

হায় মা মহামায়া!

দয়ার প্রাণ আচার্য্যঠাকুরও ভক্তিভাজন যজমানের অবস্থা দেখিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি আর প্রিয় ছাত্র-শিষ্য রঘুনাথের পক্ষে থাকিতে পারিলেন না। হিমাদ্রি টলিল,

প্রোজ্জ্বল বহ্নি-শিখা নিষ্প্রভ হইল, পূর্ণিমায় অমার আঁধার ঢাকিল! তিনি বিষাদিত স্বরে বলিলেন, প্রিয় হিরণ্য, এক কার্য্য করিলে কি হয় না?

হিরণ্য কহিলেন, প্রভুর আদেশ কি বলুন?

"রঘুনাথের বিবাহ দাও, ইহাই সংসার-কারাগারের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল।"

কথাটা উভয় ভ্রাতারই প্রাণে লাগিল! এ যে ঠাকুরের সময়োপযোগী অমোঘ বাক্য। তখন হিরণ্যদাস ভাবিয়া দেখিলেন, যখন ঠাকুরের অপার দয়া পাইয়াছি, তখন এই সময় আর একটী প্রার্থনা বা না করি কেন? অবশ্যই ঠাকুর বাসনা পূর্ণ করিবেন! প্রভু যে দয়ার সাগর।

হিরণ্য সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। তাহাই হইবে। আমরা শীঘ্রই শ্রীমানের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিব। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কি সঙ্গত হয় না?"

"কি কার্য্য বাবা, যাহা করিলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহাই করিব।"

সরল ঠাকুর যজমানের সজল চক্ষু ও ম্লান মুখ দেখিয়া একেবারে দ্রব হইয়া গিয়াছিলেন।

বিষয়ী হিরণ্যও সময় পাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের কথা—যবন হরিদাসকে ঠাকুরের বাটী হইতে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব—ঠাকুরের পদে নিবেদন করিলেন।

ঠাকুর তখন আশুতোষ, ভক্তের প্রার্থনার গুরুত্ব ও দায়িত্ব না বুঝিয়াই বর দিলেন "তথাস্তু" তাহাই হইবে। সভা ভঙ্গ হইল। সেদিন জমিদার যজমানদ্বয় আচার্য্যঠাকুরকে ছাড়িলেন না। যজমানের সনির্ব্বন্ধাতিশয়ানুরোধে দয়াল ঠাকুরও রহিয়া গেলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীমানের বিবাহ-সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা-মন্ত্রণা চলিল। মন্ত্রণায় যাহা স্থির হইল, সে রাত্রিতে আর জানা গেল না। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, ফাটা পদে ছিন্ন-চটি-সংবদ্ধ—ন্যুব্জ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী-সংস্থাপিত—কটিদেশে অর্দ্ধমলিন-চীর-উত্তরীয়বিজড়িত—কক্ষে লোহার বাঁটের শত-কীটদষ্ট ছত্রধৃত "নুলো হরিমোহন ঘটক" পাত্রী অন্বেষণে হরিপুরের কাচারি-গৃহ হইতে "জয় মা জগদম্বা" বলিয়া দ্রুতপদ-ক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুলাচার্য্য নুলো হরিমোহন সাতগাঁর হিন্দুগৃহস্থমাত্রেরই পরিচিত। তবে তাঁহার ঘটকালী কার্য্যের পারদর্শিতায় সর্ব্বপরিচিত কি, বামহস্তের অঙ্গুলিহীনতা বশতঃ বিধি-করুণায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহার এ পর্য্যন্ত সুমীমাংসা হয় নাই। কিন্তু ইহা অভ্রান্ত যে, পল্লিবালকগণ তাঁহাকে অঙ্গুলীহীন নুলো দেখিয়া হরিমোহন নামের অগ্রে "নুলো" এই

বিশেষণটী সংযোগ করিয়া দিয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। আর ইহাও সত্য যে, তাহাদের সহিত তাঁহার যে কোন স্থানে সাক্ষাৎ হউক না, তখনি তাঁহাকে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখা যাইত। টোলের বকাট ছোঁড়ার দল না কি তাঁহার ঐ ধাবনাবস্থা দেখিয়া—

"ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥"

তন্ত্রের এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিত। তাহাতে ঘটকরাজ হরিমোহন দেশের টোলের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। যখন তখন যাহার তাহার নিকট অঙ্গুলিহীন কর দোলাইয়া বলিতেন, "টোলের সৃষ্টি দেশে ষাঁড় তৈয়ারির জন্য। এ পাপ দেশে না থাকাই ভাল।" সেই সঙ্গে তাহাদের অধ্যাপকদিগকেও তিনি গালি দিতে ভুলিতেন না। তবে সেই গালি দিবার কারণ যে কেবল টোলের বকাট ছোঁড়াগুলি তাহা নহে। সে একটী গুপ্ত রহস্য। তন্ত্রশাস্ত্রের আর একটা কঠোর অনুশাসন বাক্য লইয়া। তন্ত্রের কোন স্থানে না কি লিখিত আছে,—

"ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি! স্পর্শেষু যত্নতস্ত্যজেৎ॥"

"ব্রাহ্মণ ঘটক হইলে তাহাকে কদাপি স্পর্শ করিবে না।" টোলের অধ্যাপকগণ মিলিয়া এক শ্রাদ্ধ-সভায় এই শ্লোক আওড়াইয়া এক ব্রাহ্মণ ঘটককে নিতান্ত অপদস্থ করিয়া ছিলেন।

হরিমোহন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঘটক। সুতরাং অধ্যাপকগণের এই উক্তি—তাঁহার প্রতিই উক্ত, এই সিদ্ধান্তে হরিমোহন যথায় তথায় অধ্যাপকগণের কথা পাড়িয়া তাহাদিগকে গালি দিয়া আপনার অন্তর্জ্বালা জুড়াইতেন। যাহাই হউক, অন্যপক্ষে সকল স্থানেই হরিমোহন ঘটকের প্রসার-প্রতিপত্তি সমধিক ছিল। বিশেষতঃ পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতারা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন ও ভাল বাসিতেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্যযোগ্যা পাত্রপাত্রী সংযোজনে পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। তাহাদের নিকট তিনি "নুলো হরিমোহন" ছিলেন না, ছিলেন সিদ্ধিদাতা হরিঠাকুর। ঘটক-চূড়ামণি আর কিছু সঞ্চয় করিতে পারুন বা না পারুন, দেশসম্মানে স্বাধিকারে তিনি বিরাট্ দাম্ভিকতার অধিকারী হইয়াছিলেন।

হরিমোহন অবিরাম হাঁটিতে হাঁটিতে বেলা এক প্রহরের সময় হরিপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী আক্না গ্রামে উপস্থিত হইলেন। আক্নার ঘোষ-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। কুল-মর্য্যাদায়, আচারে, ব্যবহারে, তৎকালীন সমগ্র কায়স্থ-সমাজের আদর্শ ও শিরোমণি ছিল। ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয় আক্নার একজন সঙ্গতি-সম্পন্ন প্রতাপবান্ শিক্ষিত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে বারমাসে তের-পার্ব্বণ, চিকিৎ-সালয়, চতুষ্পাঠী ও অতিথিশালা ছিল, অভুক্ত অতিথি কখন বাটী হইতে বিমুখ হইত না। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, তাঁহার

সন্তান ছিল না। মাত্র রেবতী নাম্নী কন্যা ও বিধবা পত্নী রাখিয়া চন্দ্রকান্ত ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিভাবকহীন সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, মৃত চন্দ্রকান্তের সংসারে তাহাই ঘটিল। বারভূতে মিলিয়া তাঁহার সোণার সংসার শ্মশান করিয়া তুলিল। এক্ষণে তাঁহার বিধবা পত্নী ও বালিকা কন্যাটী পরান্নে সংস্কারহীন বিবর্ণ গতশ্রী নিজ অট্টালিকায় কোনরূপে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। হরিমোহন পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে তাঁহারই গৃহে অতিথি হইবেন স্থির করিয়া আসিতেছিলেন, আবার পথিমধ্যে কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলেন যে, মৃত চন্দ্রকান্তের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছে, এমন কি তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সামর্থ্য ও স্বচ্ছলতা নাই। তবে তাঁহার একটিমাত্র কুমারী কন্যা—শ্যামা, সুকেশী, স্বল্পলোমা, সুভ্রূ, সুশীলা, সুগতি, সুদতী, ক্ষীণমধ্যা, পঙ্কজাক্ষী—যাহা শাস্ত্রকারগণ হীনবংশোদ্ভূতা হইলেও গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ অনিন্দিতা পাত্রী শতের মধ্যে কেন সহস্রের মধ্যেও একটী সুলভ কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস ত নিঃস্ব নহেন, সুতরাং এখনকার মত তাঁহাদের কন্যার পিতৃ-সম্পত্তির প্রতি গৃধিনী-দৃষ্টিই বা হইবে কেন? বংশ-মর্য্যাদায় বরণীয়া পাত্রী যদি সুলক্ষণা হয়, তাহা ত মণিকাঞ্চন সংযোগ। অতি সৌভাগ্যের কথা!

ঘটক হরিমোহন মনে মনে এই সকল বিষয় বহু

আলোচনা করিয়াই প্রায় মধ্যাহ্নে ৺চন্দ্রকান্তের বিধবাপত্নীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রেবতী তখন তাহার পুত্তলিকা-কন্যার বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত ছিল। আজ তাহার কন্যার শুভ-বিবাহ। অনেক বরযাত্রী আসিবে, প্রতিবেশিনী সঙ্গিনীরা তাই তাহাদের আহারাদির আয়োজন করিতেছিল, আর নিজে খোলামকুচির ঝোল, মাতৃত্যক্ত বেগুনবোঁটার ভাজি, তেলাকুচা পাতার শুক্ত, আমরুল-শাকের চাটনী, ইঁদুর মাটির অন্নরাশি রাঁধিয়া পাকা-গৃহিণীর ন্যায় তাহার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার খেলাঘরটী পূর্ণ করিতেছিল, আর হাসি হাসি মুখে বলিতেছিল, আজ ঘটক হরিমোহন ঠাকুর আসিলেই হয়, তাহাকে বলিব, বেহাইকে বলিয়া আমার মেয়ের গা সাজন্ত গহনা দিতেই হইবে।

এমন সময় সাক্ষাৎ হরিমোহন ঘটক বালিকা রেবতীর পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া বলিলেন. হাঁ মা, চন্দ্রকান্ত ঘোষজা মহাশয়ের বাটী কি এই ?

রেবতী আগন্তুককে দেখিয়া সলজ্জভাবে বলিল, হাঁ, এই ত আমাদের বাড়ী। আপনি কাহাকে চান্ ?

"এই বাটীর অভিভাবক কে ?"

রেবতী বাক্যার্থ বুঝিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নত-দৃষ্টিতে হরিমোহনের প্রতি চাহিতে ছিল।

হরিমোহন পূর্ব্বশ্রুত অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন যে, এই চন্দ্রকান্তের অবিবাহিতা কন্যা-রত্ন।

রেবতী হরিমোহনকে চিনিত না, সে তাহার প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়াও পাইতেছিল না। আবার মৌন থাকাও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। তাই ভাবিয়া রেবতী কিয়ৎক্ষণের পর সরলভাবে বলিল, আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে বলিতেছি—

বলিয়া সে দ্রুতপদে বিজলীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আসিল না। হরিমোহন স্থিরদৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গশোভনা কুসুমকান্তি বালিকার অনুপম সৌন্দর্য্যে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া ছিলেন এবং পুনঃ বালিকার আগমনের আশা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণের পর অন্তঃপুর-প্রবেশ-দ্বারের কবাটের অন্তরালে একটী অতি বৃদ্ধা কহিলেন, আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন?

হরিমোহন অঙ্গুলিহীন করটী লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, আমার নাম হরিমোহন ঘটক; সাতগাঁ হইতে আসিতেছি।

"আবশ্যক কি, কাহাকে আপনার প্রয়োজন?"

"মৃত ঘোষজা মহাশয়ের কন্যার সম্বন্ধ আনিয়াছি, এই বাটীর বর্ত্তমান অভিভাবককে প্রয়োজন।"

"এ শ্মশানভূমির আর কে অভিভাবক আছ বাবা, পুরী শূন্য হইয়াছে, পাঁচ ভূতে সর্ব্বস্ব লুটিয়াছে, তার অনাথা বিধবা পত্নীই এই শূন্য পুরীর অভিভাবক, এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানি ছিন্ন কুশাসন আনিযা ঘটক মহাশয়কে বসিতে দিলেন। হরিমোহন আসনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন, যে মেয়েটী আপনাকে

আমার আগমন সংবাদ জানাইল, ঐটীই বোধ হয় ঘোষজা মহাশয়ের অবিবাহিতা কন্যা ?

"হাঁ বাবা, ঐ হতভাগী যখন ওর মার পেটে, তখন চন্দ্র আমার আমাদিগকে অকূলে ভাসাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বৃদ্ধার চক্ষে জল না থাকিলেও তাঁহার বাক্যের ভিতর দিকটা অশ্রু-বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল।

হরিমোহন সমব্যথিত স্বরে বলিলেন, চন্দ্রকান্ত বাবু আপনার কে হইতেন ?

"আমার ছোট ভাই, আমার সাত ছোট সে, রাক্ষসী আমি, এখনও বাঁচিয়া আছি। বাছা আমার অভাগীকে শ্মশান আগ্‌লাইতে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

"আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর কি কোথাও সম্বন্ধ হইয়াছে ?

"কে সম্বন্ধ করিবে বাবা, বৌটা ত ভাবিয়া ভাবিয়া কাঠ হইতেছে। মেয়ে নয় পার হইয়া দশ বৎসরে পা দিয়াছে, কে বলিবে দশ বৎসরের মেয়ে! মনে হইবে বার বৎসর। গরীবের মেয়ের বর কি সহজে মিলে বাবা!

"আপনারা আবার গরীব কিসের ? গরীবের নাম কি জগৎ এতদিন জাগ্রত রাখিতে পারে ? ঘোষজা এদেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।"

"এখন নামে মাত্র তালপুকুর রহিয়াছে বাবা, একটীও তালগাছ নাই।"

"মানুষের সব দিন সমান যায় না মা! তাহাতে হইয়াছেই বা কি? বুনিয়াদের আঁস্তাকুড়ও ভাল। আমি একটী যোগ্য ঘরের যোগ্য বরের সন্ধান লইয়া আসিয়াছি মা, যদি পছন্দ করেন, তাহা হইলে এই মাসের শেষ লগ্নে আমি এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারি।"

"বরের বাড়ী কোথায়? মা বাপ আছেন ত বাবা?

"সব দিকেই ষোলকলা পূর্ণ। কোনটায় খুঁত নাই। শুন্‌লেই আপনাদের মত হবে।" শেষে একটু গর্ব্বিতস্বরে হরিমোহন বলিলেন. অপছন্দ ঘরবর লইয়া হরিমোহন ঘটক কাহারও সম্বন্ধে বাহির হয় না।"

বৃদ্ধা দেশপ্রসিদ্ধ হরিমোহন ঘটকের নাম সবিশেষ জানিতেন। ঘটকরাজ যে বিবাহসম্বন্ধে সুদক্ষ, পরিপক্ব ও কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

বৃদ্ধা সকরুণ হাস্যমুখে বলিলেন, বাবা আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কোটী কোটী প্রণাম, আপনি আমাদের মুখ চাহিলেই যথেষ্ট। বরের বাড়ী কোথায়, কাহার পুত্র বাবা!

"সাতগাঁর জমিদার হিরণ্য দাসের কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। কেমন মা, মনোমত হয় কি?"

"অন্যমত কেন হইবে বাবা, তবে আমরা যে দরিদ্র।"

"কন্যার অর্থে তাঁর প্রয়োজন কি মা? তিনি ত আর দীন-দরিদ্র নহেন!"

"এ কুটুম্বিতায় তিনি সুখী হইবেন কেন?"

"কন্যা দেখিয়া সুখী হইবেন।"

"তিনি অর্থ ও সুকন্যা উভয়ই ত পাইতে পারেন।"

"দুরূহ।"

"অনাথা বিধবার কন্যার অদৃষ্টে কি এত সুখ আছে বাবা!"

এই বলিয়া বৃদ্ধার ভাঙা সুরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই তপ্ত-অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিমোহন ঘটক চাঁদপুরে আসিয়াই রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস ও জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া রেবতীর সহিত রঘুনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিলেন। শুভদিনে ও শুভক্ষণে সেই শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন পক্ষেই কাহারও কোন অসুবিধা বা গোলযোগ ঘটে নাই। শোনা যায়, রাঙা-দিদিমা না কি এই বিবাহে খুব কোমর বাঁধিয়া খাটিয়া ছিলেন এবং তাঁহার যাহা কিছু স্বামিদত্ত গুপ্তধন ছিল, তাহা তিনি অকপটে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ক'নে বৌকে তিনি অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিতেন, সে আহ্বানে রেবতীও তাহার সুন্দর মুখখানিতে গালভরা হাসি হাসিত। রেবতা তাঁহার মনের মত হইয়া ছিল। তাই দিদিমার স্নেহে রেবতা তাঁহার বিশেষ আনুগত্য স্বীকার করে। আরও শোনা যায়, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস

ঘটকরাজ হরিমোহনকে এই বিবাহোপলক্ষে এত প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন যে, আর তাঁহাকে সে জীবনে ঘটকালী করিতে হয় নাই। শেষে পাড়ার ছেলেদের যন্ত্রণায় সস্ত্রীক হিন্দুর চির-সম্মানিত ও আরাধিত শান্তিভূমি ৺কাশীধামে যাইয়া জীবনের গণা দিন কয়েকটা অদ্বৈতবাদে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে গোবর্দ্ধন পুত্রের বৈরাগ্য-ছেদনের মহাস্ত্র হইয়াছে ভাবিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। রঘুনাথও এই বিবাহে অসুখী হন নাই। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী গুণবতী রেবতী অতি অল্পদিনেই তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া লইল।

এদিকে বৈরাগ্যোদ্দীপক হরিদাস ঐ সময়েই সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অভ্যাস যোগে যে যোগী, তাঁহার যোগস্মৃতি কি বিস্মৃত হইবার না ত্যাগের? সুতরাং এই সকল বৈরাগ্যবিরোধী নানা ঘটনা সংঘটিত হইলেও রঘুনাথের চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইল না। যে স্রোত সমুদ্রাভিমুখী, তাহার বেগ ফিরাইবার সাধ্য কার? বিষয়-বিতৃষ্ণ সুখ-বিলাস-বীতরাগ রঘুনাথ দিন কয়েকের জন্য মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার তাঁহার হৃদয়ের বৈরাগ্যবহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল! ব্যাধ যেমন পক্ষী ধরিবার জন্য ফাঁদ বিস্তার করিয়া রাখে, গোবর্দ্ধনও তেমনি পুত্রকে বৈরাগ্য-প্রতিকূল মোহ-নিগড়ে আবদ্ধ রাখিতে পার্থিব ভোগ-বিলাস সম্পদ্ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। মনোজ্ঞ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট সুন্দর পরিচ্ছদ, বহু মূল্যবান্ দুর্লভ রত্নালঙ্কার, রসনা-

প্রিয় সুখসেব্য সুস্বাদু খাদ্য, দাসদাসী-সেবাপ্রভৃতি আপাত মনোরম তৃপ্তিকর আসক্তিময় উপাদানসকল রঘুনাথের অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ সে সকলই ছায়ালোকের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বোধ করিতেন। যেন তাহারা তাঁহার ধ্যেয়বস্তুর অনন্য সাধারণ রূপ-সৌন্দর্য্যের নিকট কিঞ্চিৎ ঋণ করিয়া এই তুচ্ছ রূপ-সৌন্দর্য্য আনিয়াছে। সে সকল তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। রঘুনাথ তাহাতে কণ্টক-বিদ্ধের ন্যায় যাতনায় আকুল হইয়া উঠিতেন। ত্যাগব্রতপরায়ণ তপস্বীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইতেছে ভাবিয়াও তিনি গৃহেই তপশ্চর্য্যায় মনোযোগী হইলেন। সাত্ত্বিক আচারে, সাত্ত্বিক ব্যবহারে, সাত্ত্বিক আহারে সত্বগুণাশ্রিতা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার রত্ন-অট্টালিকায় অতি সঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাহারও সহিত অতিরিক্ত কথা কহিতেন না। কেবল মধুলব্ধ ভ্রমরের মত তাঁহার প্রাণের আরাধ্য বিগ্রহের দিকে ঝুঁকিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন।

ঐ সময়েই নবদ্বীপের শ্রীগৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। রঘুনাথ লোকপরম্পরায় তাহা শুনিলেন। আর কি ভক্তি-প্রাণ সেই বাঞ্ছিত নিধিকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। দৃষ্টির অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা শান্তিপুরের দিকে ছুটিল। শ্রোত্র পবিত্র সংকীর্ত্তন শুনিতে সমুৎসুক হইল। মন, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সম্বলহীনভাবে দরিদ্র সাজিল। রঘুনাথ

কি উপায়ে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই জগৎ-সূর্য্য-শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পদাশ্রিত হইবেন, তাহাই দিবারাত্র উন্মনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন হইতেই তিনি একটী নির্জন-প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। রূপ-সৌন্দর্য্য-গুণবতী রেবতী স্বামীর উৎকণ্ঠার ভাব প্রথমেই সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া ছিলেন এবং একদিন স্বামীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ বলিলেন,—তুমি বালিকা, কি করিয়া বুঝিবে এই সংসারের অনিত্যতা।

রেবতী কিয়ৎক্ষণ রঘুনাথের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বুঝাইলে না বুঝিব কেন?

"মোহ তাহা বুঝিতে চাহে না। কেহ বুঝাইলে বরং বিরক্ত হয়।

"মোহ কি?"

"যাহা প্রকৃত সত্যকে ভুলাইয়া মিথ্যায় মজাইয়া রাখে।"

"মিথ্যা কি?"

"যাহা কিছু চক্ষুর প্রত্যক্ষ বিষয়।"

"সত্য কি?"

"এক ভগবান।"

"তাঁহাকে কে দেখিয়াছে?"

"যে তাঁহার অনুগ্রহ পাইয়াছে।"

"কে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করে?"

"সাধকে সাধনায় লাভ করে।"

"তাঁহাকে লাভ করিয়া কি ফল হয়?"

"আনন্দ।"

"সংসারে কি সে আনন্দ নাই ?"

"আনন্দ সর্ব্বত্রই। কিন্তু নিত্যানন্দ নাই। অসম্পূর্ণ আনন্দ। সে আনন্দ ক্ষণিক! এই আছে, এই নাই। তৈল জলে মিশ্রণ হয় না। মিথ্যার আনন্দ মিথ্যা। সত্যের আনন্দ অমর—ধ্বংসশীল নহে। সে আনন্দের ক্ষয় নাই। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে দুঃখও নাই। নিত্য আনন্দ ও নিত্য শান্তিময়!"

"যদি চক্ষুর প্রত্যক্ষ বিষয় মিথ্যা, তাহা হইলে সেই মিথ্যায় এই জগতের জীব মুগ্ধ কেন ?"

"এই ত মোহের শক্তি।"

"তুমি কি সেই শক্তির হাত এড়াইবে ?"

"সাধ্য কি! তবে তাঁহার অনুগ্রহে সবই সম্ভবে।

"আমাকে এবং এমন কি পিতামাতাকেও ছাড়িবে ?"

"কেহ কাহাকেও জড়াইয়া নাই। সকলেই ছাড়াছাড়ি! সংসারে জীবন-সম্বন্ধ যতদিন, ততদিন জড়াজড়ি। তাহার পর সব ছাড়াছাড়ি! কেবল একের সহিত ছাড়াছাড়ি নাই। তাঁহার সহিত জীবের সম্পদে, বিপদে, ইহলোকে, পরলোকে, সর্ব্বত্রই সমভাবে অক্ষুণ্ণ সম্পর্ক!

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া চতুর্দ্দশীর শশী একটু মলিন হইয়া নীরব রহিল। অজ্ঞাতে একটী তপ্তশ্বাস চারিদিকের বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া চকিতে মিশাইয়া গেল। সে উত্তপ্ত বায়ু যে রঘুনাথের

বক্ষঃ স্পর্শ করিল না, এমত নহে। রঘুনাথ কিয়ৎক্ষণ তাহাতে স্তব্ধ রহিলেন এবং পরে কহিলেন, রেবতি, প্রাণে কষ্ট পাইলে কি ?

"যাহাতে তোমার সুখ-শান্তি ঘটিবে, তাহাতে আমি কষ্ট ভাবিলে আমায় যে পাপ স্পর্শিবে প্রিয়তম !"

স্বামীর বৈরাগ্যভাবে রেবতীর অশ্রু ছল ছল করিতে ছিল। করুণপ্রাণ রঘুনাগ রেবতীর অবস্থা-প্রবাহে ক্ষণেকের জন্য বিচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ তখন ভাবিতে ছিলেন, রেবতী সত্যই তাঁহাকে আত্ম-বলিদান করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিদান কি সেই অপূর্ব্ব সরলা অজ্ঞানা রেবতীকে ত্যাগ !

দশম পরিচ্ছেদ

নব দম্পতির বিবাহিত জীবনের দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। প্রাপ্ত-যৌবনা রেবতী রঘুনাথের প্রেম-রাজ্যের এক-মাত্র অধিকারিণী হইতে সন্ন্যাসিনী সাজিতেও দুঃখিতা হয় নাই। স্বামী গৈরিক-বসন-ধারী, রেবতীও নিরাভরণা গৈরিক-বসনা ! স্বামী নিরামিষাহারী, রেবতী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মৎস্য-মাংসত্যাগিনী ! স্বামী সুখ-বিলাস-শয্যাত্যাগী, রেবতীও সেই সকল অম্লান-প্রাণে বর্জ্জন করিয়াছিল। স্বামী তৈল মাখিতেন না বলিয়া

তদনুকরণে রেবতীরও সুচারু চাঁচরকৃষ্ণকুন্তল 'রুক্ষ তাম্রবর্ণ জটায় পরিণত হইতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বৈরাগ্যের এইরূপ তীব্র শাসনে রূপবতী রেবতীর অঙ্গশ্রীর কোনও শ্রী-হানি ঘটে নাই। বরং অপরিচিত স্বর্গের অপরিমিত সৌন্দর্য্যের প্রস্ফুটিত পারিজাত-কান্তি সন্ন্যাসিনীর শান্ত সৌম্য পাতিব্রত্য-সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিকে আরও সুন্দর, আরও মধুর, আরও শ্রীশালিনী করিতেছিল।

এতদবস্থায় রঘুনাথ কিছুদিন পরেই অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন। পুরীসংলগ্ন বাহিরপ্রাঙ্গণস্থ চণ্ডীমণ্ডপে তিনি তাঁহার আশ্রয়স্থান স্থির করিয়া লইলেন। সেই পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তিনি তপঃ-জপ-ধ্যানে তন্ময়ভাবে দিনরাত্রিই কাটাইতেন। রেবতী কুললক্ষ্মী, তাহাতে সম্ভ্রান্ত জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের পুত্রবধূ, সুতরাং আর বাহির প্রাঙ্গণস্থ চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া স্বামীসহবাসে থাকিতে পারিল না। হতভাগিনী সেইদিন হইতে আপনার হৃদয়ারাধ্য প্রাণের প্রাণ পতিদেবতার পদ-সেবায় বঞ্চিত হইল।

অলকা ও বিজয়া রঘুনাথের এবম্বিধ আচরণে বিশেষ কোন বাধা দিতে সাহস করিলেন না, ভয়—পাছে ত্যাগব্রতী গৃহযোগী সেই বাধায় এই সুখ-প্রাসাদের লক্ষ্মীশ্রী গ্রাস করিয়া চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করে! মাত্র তাঁহারা হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রঘুনাথের প্রকৃতির অনতিলঙ্ঘনীয় কার্য্যে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বহু দুঃখদুর্ভোগ সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইহাতে রাঙাদিদিমা রঘুনাথের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি অন্নপূর্ণাকে গোপনে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "রঘু তোর পা ধরিয়া কাঁদিয়া না সাধিলে তুই তাহার সহিত কখন বাক্যালাপও করিস্ না, সেবা ত দূরের কথা!"

কিন্তু অন্নপূর্ণা রেবতী রাঙাদিদিমার সে পরামর্শ গ্রহণ করে নাই বরং একটু অবাধ্য হইয়াছিল। রেবতী মাঝে মাঝে রাঙাদিদিমাকে সঙ্গে লইয়া নিশীথে গোপনে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং তাহার হৃদয়ের করুণ-নিবেদন অশ্রুতে রঘুনাথের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া আসিত। রেবতীর আগমনে রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিতেন, কখন বা ভগবানের উদ্দেশে আকুল-রোদনে তাঁহার নিকট মনের বল ভিক্ষা করিতেন। ক্রমে রঘুনাথ স্বায় শরীর-নিগ্রহে, তপশ্চরণে ও দীর্ঘ উপবাসে মনোযোগী হইলেন। ইহাতে পিতা গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য দাস অতিশয় ভাবিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু উপায় কি? আশঙ্কা শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় রঘুনাথ কোন্ দিন বা সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যান! তজ্জন্য তাঁহারা রঘুনাথের কার্য্যে বিশেষ কোন বাধা না দিয়া তাঁহাকে প্রহরা দিবার নিমিত্ত কয়েকজন বিশ্বস্ত বলবান্ সাহসী সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সকলই ভস্মাহুতি হইল। শৈশব-জাত বৈরাগ্য আর শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন-প্রত্যাশা তাঁহাকে শত সহস্র কণ্টক-বাধা ও অভিসম্পাত হইতে পৃথক করিয় একদিন গভীর রজনীতে শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া চলিল। সতর্ক

বলিষ্ঠ লৌহকায় প্রহরীগণ এ পলায়নের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তত্ত্বও বিন্দুবিসর্গ অবগত হইল না। তাহারা সেইদিন নিদ্রাবশে এত অভিভূত হইয়াছিল যে, সে তরঙ্গের কলধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইল না। যেন সেই ধ্বনি শূন্য দিয়া আসিয়াই শূন্যে মিশিয়া ছিল। তাই মর্ত্ত্যবাসীর কর্ণে আদৌ প্রবেশ করিল না।

প্রভাতে দাস মহাশয়ের বাটীতে তুমুল ঝড় বহিল। হায় তাঁহাদের বংশের একটীমাত্র দীপ্ত-মাণিক্য পুরী অন্ধকার করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! দুইচারি দণ্ডের মধ্যে সপ্ত-গ্রামের অপোগণ্ড শিশু হইতে অসূর্য্যম্পশ্যা বধূদের এ সংবাদ অজ্ঞাত রহিল না। মুহূর্ত্তে লোকে লোকারণ্য হইল, বাহির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিল। অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সাশ্রুনয়নে বাহির গৃহের চত্বরের ধূলায় রঘুনাথের বিরহে গড়াগড়ি দিতে ছিলেন। উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণ রঘুনাথের অনুসন্ধান উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত পাথেয় দিয়া পদাতি পাঠাইতে লাগিলেন। সকলেই ম্রিয়মাণ শশব্যস্ত! কোটী কোটী কণ্ঠে আজ "হায় হায়" মর্ম্মান্তিক রব!

রেবতী রাত্রিতে দিদিমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া দিদিমার মুখনিঃসৃত অলৌকিক কল্পনাময়ী রূপকথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া যখন শুনিল, তাহার হৃদয়-দেবতা আর তাহার পূজা লইবেন না বলিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তখনই সে কিয়ৎক্ষণ নির্নিমেষ-নেত্রে নির্ব্বাক্-

বিস্ময়ে অটল অচল স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে বজ্রাহতা কুঞ্চিতাকদলী তরুর মত ভূমিলগ্ন হইল। অমনি অন্তঃপুরস্থ প্রবল রোদন-ধ্বনি ভঙ্গ হইয়া "হায় কি হইল" এই সুর আরও বিষাদময়ী রাগিণীতে বাজিয়া উঠিল! দিদিমা দ্রুত আসিয়া রেবতীর শোণিতহীন পাংশু-শুষ্ক মুখমণ্ডলে ও অধরোষ্ঠে হিমজল সেচন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা চণ্ডের মা ব্যজন করিতে লাগিল। কনক-প্রতিমা রেবতী তখন মূর্চ্ছিতা! তাহার মূর্ত্তি তখন তুষারের মত শীত শুভ্র! অনেকক্ষণ চৈতন্যের সঞ্চার হইল না! কিছুক্ষণের সেবা-শুশ্রূষায় রেবতী অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে অস্ফুটজড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ওগো—বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—আমার দেবতাকে তোমরা খুঁজিয়া আনিয়া দাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্ন অতীত, তখনও রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের চরণামৃত-লালসায় শুষ্কমুখ চাতকের ন্যায় শান্তিপুরের পথে পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহার অতি দীন দরিদ্র বেশ! তিনি যে কোটী-পতি ধনকুবেরের পুত্র ইহা দেখিয়া কাহারও প্রতীতি হইল না। তীর্থযাত্রী ভিখারীর মত নিঃস্বভাবেই যাইতেছিলেন। কতক্ষণে পুরুষোত্তম নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন, কতক্ষণে তাঁহার দিব্যোন্মাদমূর্ত্তি সন্দর্শন করিবেন ইত্যাদি

গভীর চিন্তা তাঁহাকে সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধভাবে সামর্থ্যের অনুকূলে কখন বা ধীরপদে, কখন বা দ্রুতপদে ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যাকুল প্রাণে ছুটাইতেছিল। বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়! হৃদয়ের অভ্যন্তরাসনে সাধনার শান্তমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে রঘুনাথ এ বিশ্বরাজ্যের পর কোন সুধাস্নিগ্ধ স্বতন্ত্র রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে অবিদ্যার লেশ নাই। আধিভৌতিকের অত্যাচার নাই! সুখভোগ-বিলাসের আবিলতা নাই! নিত্য নির্ম্মল শুদ্ধ সত্য চৈতন্যময় আনন্দ শারদীয় গঙ্গার তরঙ্গের ন্যায় খল খল হাসিয়া অবিরাম চলিতেছে। তিনি তাহাতেই উদ্বোধিত, অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াই আসিতেছেন। তখন তাঁহার আবার অন্য ভাব থাকিবে কেন? একমাত্র আরাধ্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মই তাঁহার অন্তরের অন্তঃসলিল-প্রবাহ—তাহাতেই ভাসিয়া ভাসিয়া স্রোতের তৃণের মত অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিল! সকল যন্ত্রণা, সকল বিঘ্ন, সংসারের সকল আশা ভরসা অবজ্ঞা করিয়া তিনি প্রহরেক রাত্রিকালে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদানীন্তন ভক্তমণ্ডলীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের প্রাঙ্গণে ভক্ত-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উচ্চ সংকীর্ত্তনরোল উত্থিত হইতেছিল। সেই সংকীর্ত্তনের মধুর-ধ্বনি রঘুনাথের জন্মজন্মান্তরের অতি পরিচিত রাগিণীর মত আসিয়া কর্ণে বাজিতে লাগিল। ধ্বনি অনুসরণে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই গঙ্গাবারিধৌত পবিত্র প্রাঙ্গণে

আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গৌর-সুন্দর রূপ দর্শনে আজ তাঁহার নয়ন-যুগল সার্থক হইল। ভক্তি-শ্রদ্ধায় বুকখানা ভরিয়া উঠিতে লাগিল। যে অন্তর-গিরিশৃঙ্গের নিভৃত-পীঠ হইতে তাঁহার স্বভাবজাত ভক্তি-জলধারা অবিরাম ছুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহা এতদিনের পর বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে—সে আনন্দের উচ্ছ্বাস রঘুনাথের ক্ষুদ্র বক্ষমধ্যে স্থান পাইতেছিল না, তাই দুই চক্ষে জল-ধারা ঝরিতেছিল। আর সংসার-মোহ "আয় আয়" করিয়া আহ্বান করিলেও বৈরাগ্যের বিদায়সুর তাঁহাকে চির-বিদায় দানে বিসর্জ্জনের বিজয়-বাদ্য বাজাইয়া শক্তিমান্ করিতে লাগিল। তখন রঘুনাথ যেন ভগবানের অমৃতময় শীতল করুণার শান্তির শ্যামঘনাবৃত ছায়ায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছিলেন।

ক্রমে গভীর নিশীথে সংকীর্ত্তন বন্ধ হইল। ভক্তগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া এক বৃক্ষতলে স্থান লইলেন। তখনও তাঁহার সংকীর্ত্তনের একটা মৃদুমাদকতা কাটে নাই। সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। পরে জীবনরক্ষাবৃত্তির অনুগামী হইয়া নগরে মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং এক মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা লইয়া এক নিভৃত স্থানে তাহাই রন্ধন করিয়া আহার করিলেন।

কয়েকদিন রঘুনাথ এইরূপে তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভক্ত-বৃন্দ-প্রসঙ্গ-সুখ নিরবচ্ছিন্ন উপভোগ করিতে লাগিলেন। সেই

সময়ে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন মূর্ত্তিমান্ শান্তরূপ নিরভিমান রঘুনাথের আশ্রয় লইয়া এই জড়-বিশ্বের চতুর্দ্দিকে তাহার অমিয়-মধু ছড়াইয়া দিতেছে। প্রীতি-ভক্তি-শ্রদ্ধা যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গে উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারের মহাজ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে। তিনি এই সাধু-সহবাসে আপনার হৃদয়-নিহিত ভক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ মনে মনে বলিতেন, হে মঙ্গলময় হরি! আমাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আর যেন এই প্রাণাধিক ধন ছাড়িয়া সংসার-অন্ধকারময় কূপে পতিত না হই। শ্রীরঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের নিকট আত্ম-পরিচয় দান না করিলেও তিনি রঘুনাথের আগমন হইতে অবস্থিতি ও মনোভাব সকলই জ্ঞাত ছিলেন। পরে তিনি যখন শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া যান, তখন রঘুনাথকে ভ্রাতৃ বাৎসল্যের কণ্ঠে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভাই রঘুনাথ! মর্কট-বৈরাগ্য ত্যাগ কর। বৈরাগ্য অতি আরাধনার ধন। যিনি অন্তরে বৈরাগ্য বীজ রোপণ করিয়া বাহিরে লৌকিক আচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহার বৈরাগ্যই সার্থক এবং তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। তিনি অনায়াসেই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া যান, নতুবা তাঁহার সমুদায় সাধনাই বৃথা, নিরর্থক ও নিষ্ফল। যাও ভাই, তুমি গৃহে যাও, এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগে অন্তরে নিষ্ঠা স্থাপনপূর্ব্বক যথার্থ ধর্ম্মানুরাগীর আদর্শ হও। তাহাতে পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজন সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে তোমার মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ হইবে।' ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবে! নির্ম্মল শান্তি পাইবে। এমন স্নেহের মিষ্ট স্বর ও সুন্দর উপদেশ রঘুনাথ ইহজীবনে কখনও কাহারও নিকট শুনেন নাই। তিনি আর মহাপ্রভুর বাক্যের কোন বাদানুবাদ করিতে পারিলেন না। মাত্র নতমস্তকে শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি লইয়া "প্রভুর আজ্ঞাই যে কল্যাণীয় শিরোধার্য্য" তাহা মুখাভাসে জানাইয়া তথা হইতে হর্ষোৎফুল্লবদনে বিজলীর ছটায় বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছদ।

নিত্য 'উৎসবোল্লাস, পূরিত অতিথি-আত্মীয়-বন্ধুজন-কোলাহল-মুখরিত দাসমহাশয়দিগের শ্রীময় আনন্দের সংসার আজ বিবর্ণ নিরানন্দ নীরব নিস্তব্ধ! সকলই রহিয়াছে, কিন্তু একটীর অভাবে সকলরই অভাব! আলোক আছে, দীপ্তি নাই! চন্দ্র আছে জ্যোৎস্না নাই! পুষ্প আছে সৌরভ নাই। নিখিল বিশ্ব সূর্য্যের অদর্শনে গাঢ় অন্ধকারে লুকাইয়াছে! বিজয়া বিজয়াদশমীর বিষাদমলিনা প্রতিমার মত আপনার অশ্রুতে আপনি নিমজ্জিত হইয়া আছেন। অলকা বিজয়াকে তাহা হইতে তুলিবার নিমিত্ত আপনিও তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছেন। শায়িত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বিসর্জ্জনের পরেও শান্তি-জলের আশায় মধ্যে মধ্যে উদ্‌গ্রীব হইতেছেন! কিন্তু শান্তিজল কোথায়! এ বিপর্য্যয়ে

তেমন পুরোহিত কে আছে যে, তিনি আসিয়া রঘুনাথের শুভ সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে শান্তি-জল সেচন করিবেন?

যে সকল পদাতি ও আত্মীয়াদি সোৎসাহে প্রাণপণে রঘুনাথের উদ্দেশ-অন্বেষণে গিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই ব্যর্থ-হৃদয়ে শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল। কেউ সেই রত্নঘটের সন্ধান বলিতে পারিল না। তখন গাঢ় প্রাবৃট্‌মেঘে একখণ্ড ঘনকৃষ্ণ কালিমময় মেঘ আসিয়া ঢাকিল! অমাবস্যার ঘনান্ধকারও তাদৃশ মলিনমসীকৃষ্ণ নহে। মধ্যে মধ্যে এক অসীম স্নেহের প্রেরণা পৃথিবীর সকল আলোক আনিয়া রঘুনাথের পিতামাতার হৃদয় সমুদ্ভাসিত করিতেছিল! আবার পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যান্ধকার-তরঙ্গে তাঁহাদের ভাঙাবুক আরও দলিত,পেষিত ও ভাঙিয়া দিতেছিল! সে নির্ম্মম আঘাত দম্পতিরা জীবনে কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই, সহ্য করা ত দূরের কথা! একপক্ষ ব্যাপিয়া এই ঘোর সংগ্রাম চলিতে লাগিল! পৃথিবীর কোনও ভাষায় তাহার স্বরূপ বর্ণন অসম্ভব।

বিপদ মানবকে বহু শিক্ষাদান করে। সুতরাং বিপদও মানবের এক শিক্ষা-গুরু। বিপদে চিত্ত চঞ্চল ও দৃঢ় উভয়ই হইয়া থাকে। বিপদ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া দেয়, আবার নির্ম্মাণও করে। ভাবী-বজ্রপতনের আশঙ্কাপেক্ষা বজ্র-পতনের ভীতি তাদৃশ কঠোর ও নির্ম্মম নহে। বজ্রপাত ত হইয়া গিয়াছে! বিপ্লব-বন্যায় ত তাঁহাদের-জীবনের যুগান্তর আনিয়াছে! দুঃখের নিদারুণ লৌহদণ্ডে ত তাঁহাদের সকল ভরসার সমুন্নত মেরুদণ্ড

চূর্ণ করিয়াছে। তবু আশার দেউটী শুষ্ক নিষ্ঠুর নৈরাশ্যের অন্ধকারে সেই চকোর-চকোরীর তৃষিতপ্রাণে উর্দ্ধনয়নে কি এক অজ্ঞাত রাজ্যের স্নিগ্ধ-সুন্দর জ্যোতিঃ দেখাইতেছিল।

সে দিন সন্ধ্যাকাল! বিজয়া ও গোবর্দ্ধন উভয়েই একই কক্ষের ধরাসন আশ্রয় লইয়া ছিলেন। দিনান্তের ম্লান আলোক পুত্রবিরহব্যথিত-ব্যথিতা দুইটীর শোচনীয় বিষাদিত মূর্ত্তি দেখিয়াই স্বধামে যাইতে অপেক্ষা করিতেছিল। মরুমধ্যে অকস্মাৎ মেঘের ধ্বনি শুনিলে হৃদয় যেমন আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, বিজয়া ও গোবর্দ্ধন কি এক মোহনস্বরে তেমনি সহসা চমকিয়া উঠিলেন। মুদ্রিত চক্ষেই দেখিলেন—সে স্বরে তাঁহাদের হৃদয়ের অমৃতদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে! আবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া উভয়েই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, উভয়েরই উজ্জ্বল কাম্যরত্ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া! স্বপ্ন নয় ত? না, না, স্বপ্ন হইবে কেন? এ যে সেই শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ আকর্ণবিস্তৃত প্রশান্ত চক্ষু! সেই মধুস্রাবী কোকিল-কণ্ঠস্বর! "মা এসেছি" বলিয়া সেই অমৃতের ধারা ছড়াইতেছে! কি উৎকট আনন্দ, সে আনন্দে মানব-জীবন স্থির থাকিতে পারে না! সহসা হৃচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলে! মৃত্যু অমনি নিজগহ্বরে প্রাণকে দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। বিজয়া ও গোবর্দ্ধন তদবস্থায় "বাবা মনে পড়েছে রে" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে দুইপার্শ্ব হইতে রঘুনাথকে বাহু আলিঙ্গনে ধারণ করিলেন। সকলই নির্ব্বাক্! সকলেরই বক্ষঃ অশ্রুধারায় অভিষিক্ত। কিয়ৎকাল সকলেই যেন এক সূতায় গাঁথা হইয়া

একটু ভাবের আরাধনায় নিযুক্ত ছিল, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, বিজয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে রঘুনাথের চন্দ্রমুখখানি দেখিতেছিল, তবুও আকাঙ্ক্ষা মিটিতে ছিল না। গোবর্দ্ধন নিজ গুপ্ত-যন্ত্রণার তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে কক্ষটী উত্তপ্ত করিতেছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় মানস-কমলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার কমনীয় মূর্ত্তিটী বসাইয়া অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন! তাঁহারও চক্ষে অশ্রুধারা। তবে সে অশ্রুধারা "মোহের কি মোহ হইতে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত ভগবানের নিকট বিনীত প্রার্থনা" তাহা কে বলিবে?

এ মুহূর্ত্ত চকিতে চলিয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরে বিজয়া ও গোবর্দ্ধনের সহসা "বাবা রে মনে পড়েছে রে" তীব্র আর্ত্ত চীৎকারে অলকা, রেবতী ও চণ্ডের মা প্রভৃতি পুরন্ধ্রীগণ স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সকলে মুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া গেল। অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রেবতী লজ্জায় রক্তিমরাগে অবগুণ্ঠনটা আরও একটু বাড়াইয়া চঞ্চলার ন্যায় কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইল। তখন তাহার হৃৎপিণ্ডটা স্পন্দিত হইতেছিল। তখনকার সময়ে গুরুজন-সমক্ষে বিশেষ কার্য্য ব্যতীত নব-দম্পতির একত্র সম্মিলন, অতি নিন্দার বিষয় ছিল। সমস্ত দিনের মধ্যে স্বামী ব্রীড়াসঙ্কোচহীনা পত্নীর সাক্ষাৎ পাইতেন কিনা সন্দেহ। গভীর নিশীথে গুরুজন-দিগের শয়নের পর নববধূ সসঙ্কোচে স্বামী-কক্ষে গমন করিতেন। এইরূপে তখন সমগ্র বাঙালী, সন্তান-সন্ততিগণকে সংযমের বন্ধনে বাঁধিয়া বঙ্গসমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেইজন্য

বর্ত্তমান যুগেও স্থানে স্থানে এখনও মাতা বিবাহার্থী বরবেশী পুত্রকে বিবাহ-যাত্রাকালে জিজ্ঞাসা করেন যে,"কোথায় যাইতেছ বাছা!" পুত্র অকুণ্ঠিতভাবে বলিয়া থাকেন, "আপনার দাসী আনিতে যাইতেছি মা!" উপস্থিতকালে" এ অভিনয় ক্রমেই সাম্যযুগবাদীদের নিন্দাজনক ও বিরক্তিকর হইয়া পড়িতেছে। রেবতী চলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার ভক্তির অর্ঘ্য প্রতি অঙ্গক্ষেপেই রাখিয়া গেল! রঘুনাথ তাহা রক্ত-সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে নত দৃষ্টির তলে সকলই দেখিলেন।

অলকা "বাবা আমার—এত পাষাণ তুই" বলিয়া বারংবার রঘুনাথের মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহারও গণ্ড তপ্ত অশ্রু-ধারায় ভাসিতেছিল। চণ্ডের মাও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কণ্ঠে স্নেহ ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, কোন্ দুঃখে সোনার রাজ্যি ছেড়ে গেছ্‌লে দাদা আমার! এমন করে কি বাপ-জেঠা-মা-জেঠাইমাকে কাঁদাতে হয় মাণিক!

বৃদ্ধা চণ্ডের মা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অধীরভাবে রঘুনাথের হাত ধরিয়া বলিল, চল চল দাদা আমার, মুখে হাতে জল দিবে চল! আমি আজ বিশদিন হ'ল, তোমার মুখ ধোবার জল দিইনি।"

রঘুনাথ ভক্তি-বিস্ময়ে ও কম্পিত অধরে "চল দিদি" বলিয়া পিতামাতা ও জেঠাইমাকে ভক্তি-সম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিলেন, না বড় মা, আর ভাবিবেন না, আমি আর কোথাও যাব না। আমায় আপনারা ক্ষমা করুন।

এমন সময় বৃদ্ধ চিন্তাশীর্ণ হিরণ্য ক্ষুদ্ধপদে অজস্র অশ্রু-ধারায় ভাসিতে ভাসিতে কক্ষের বাহির হইতে ক্রন্দনজড়িত স্নিগ্ধস্বরে ও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, কৈ আমার রঘু! গোবর্দ্ধন, আমার রঘু এসেছে না? কৈ সে আমাদের হারানিধি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দাস মহাশয়দিগের ম্লানমুখী পুরী আবার হর্ষের শারদ-জ্যোৎস্নায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের সমুদয় হইল। উদ্যান-শেফালিকার ঝরাফুল ত সৌন্দর্য্য ও সৌরভ দানে অসমর্থ হয় না, তেমনি রঘুনাথ জগৎবরেণ্য শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে মোহের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াও অন্তরে বৈরাগ্য রাখিয়া বাহিরে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সমুদায় বৈষয়িক কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তাহাতে সকলেই ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন হইলেন। সকলে ভাবী আশাময় সৌভাগ্যের সঞ্চার গণিলেন। সহসা রঘুনাথের চিত্তের একমুখী গতি যে এরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সকলের শুষ্ক-হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষিত শান্তির হিমবারি সেচন করিবে, তাহা কেহই পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারেন নাই। মাতা বিজয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পিতা গোবর্দ্ধনও পুত্র-গৌরবে গৌরবান্বিত অনুভব করিলেন। রেবতীর ত কথাই নাই! একে সে

পিতৃহীনা অনাথা দরিদ্রা বিধবার কন্যা, এত সুখ—এত শান্তি এত তৃপ্তি—এত আদর যে তাহার ভাগ্যের অনুকূল হইবে, তাহা বরং তাহার ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠিল। রাঙাদিদিমা কিন্তু আদি-অন্ত বলিয়া আসিতেছিলেন, "এ বয়সের ছেলেগুলার পর্ব্বই ঐ"! দুদিন বাদে সব জল হইয়া যাইবে।" তাই তিনি মধ্যে মধ্যে রেবতী-অন্নপূর্ণাকে বলিতেন, "রঘু তোর পায়ে ধরিয়া না সাধিলে তুই একটীবারও মুখ তুলিয়া চাহিবি না! কথা বলা ত দূরের কথা!" রেবতী সেই কথায় মুচকি হাসিয়া রাঙাদিদিমার পক্ষ সমর্থনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিত না বটে, তবে কখন বা রুদ্ধকণ্ঠে বলিত, "না দিদিমা, স্বামী যে নারীজাতির পরমদেবতা ও গুরু, তাঁহার সম্বন্ধে তোমার কথার কল্পনা করাও মহাপাপ!" তখন রাঙাদিদিমা চোখ রাঙাইয়া মুখ ঘুরাইয়া রেবতীর রক্তাভগণ্ডে স্নেহের ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিয়া আদরের সুরে বলিতেন, "আল্লাদী কচিখুকী আমার, ভাজামাছ উল্‌টোতেও জানেন না।" সদানন্দময়ী রেবতী অমনি প্রদীপ্ত সুধামুখে হাসিয়া বলিত, দিদিমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদে আমার সব হবে। দিদিমাও অমনি পরমানন্দে রেবতীকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।

এতদিনে রাঙাদিদিমার মনের মত আশীর্ব্বাদ-তরু ফলবান্ হইয়াছে, তাই তিনি তাঁহার লুক্কায়িত গর্ব্বটাকে আর হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে আবৃত রাখিতে পারিলেন না। যখন রঘুনাথের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন একদিন উচ্চকণ্ঠে

রেবতীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কেমন দিদিমার আশীর্ব্বাদ ফলেছ ত'? এখন দিদিমার পুরস্কার।

রেবতী অমনি গালভরা হাসি হাসিয়া প্রণত হইয়া পদধূলি লইল! দিদিমাও স্নেহের চুম্বনে রেবতীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,জন্ম এয়োস্ত্রি হয়ে থাক বোন! তোমাদিগে রেখে যেন মর্‌তে পারি!

দিদিমার স্নেহপূত চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়াছিল! তিনি এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে ছিলেন। হৃদয়ের গুপ্ত স্নেহ-সঙ্গীত ছন্দে ছন্দে সার্থক অমিয়সুরে ঝঙ্কার দিতেছিল। শেষে দিদিমা পূর্ণ সহানুভূতির কণ্ঠে একটা অনাহত গর্ব্বের প্রচ্ছন্ন ধ্বনি মিলাইয়া বলিলেন, "রঘু তোর গোলাম হয়ে থাক্‌বে জানিস্‌ অন্নপূর্ণা! তবে আমার নাম "বরি কায়েতনী"। বোধ হয়—সেকেলে দিদিমার নাম বরদাসুন্দরী ছিল।

এইরূপে সকলেরই প্রাণে বিরামবিহীন আনন্দের আলোক-রাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া দাস মহাশয়দিগের অন্ধকারময় ভবন নবভাবে সমুজ্জ্বল করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তখন বাঙ্গলার শাসনাধিপতি মহা প্রতাপশালী সৈয়দ হুসেন শাহ। তিনি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সরিফ মক্কা নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাৎকালিক খ্যাতনামা ধন-সমৃদ্ধিপূর্ণ

কালিন্দী-গঙ্গার সৈকতশোভী গৌড়নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। হুসেন শাহের সহিত বাংলার অধিপতিগণের বংশপরম্পরাগত-ভাবে কোনও সংস্রব ছিল না। যখন আবিসিনীয় মুজঃফর শাহ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর ন্যায় শস্য-শ্যামল শান্ত বঙ্গক্ষেত্রে অত্যাচার ও নৃশংসতার রক্ত-বন্যার সৃষ্টি করিতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত চির দরিদ্র আরবদেশের কঙ্করবালুকাময় প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বেশে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং নিজে ধর্ম্মসংস্কারক মহম্মদের উচ্চ বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দানে তদানীন্তন ভারতবাসী মুসলমানদিগের নিকট সৈয়দ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সৈয়দ হুসেনের অজ্ঞাত বন্ধু-রূপী ভাগ্য প্রথমতঃ তাঁহাকে সেনা-বিভাগে প্রবেশ করাইয়া দ্বিতীয়তঃ বঙ্গেশ্বর মুজঃফরের প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করিল এবং পরিশেষে বঙ্গের সিংহাসন পর্য্যন্ত দান করিয়া ছিল।

সৈয়দ হুসেন যখন রাজ্যবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়া মুজঃফরের প্রধান মন্ত্রিত্বপদ অধিকার করিলেন, তখন তিনি অদৃষ্টের অনুকূল বুদ্ধি কৌশলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ও সর্দ্দারগণের অর্থাগমের সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া লইলেন। এই সুযোগ-সুবিধার প্রধান সূত্র দুর্ব্বৃত্ত দস্যু মুজঃফরের অত্যাচার ও ঘোর নৃশংসতা। পশুপ্রকৃতি নিষ্ঠুর মুজঃফর সত্যই একজন স্বেচ্ছাচারিতার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। তখন যাবতীয় রাজ্যবাসী প্রাণস্পর্শী "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে তাঁহার কবল হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত যাহাকে তাহাকে আপনাদের

সর্ব্বস্ব বরণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল না। সেই সুযোগ-শুভমুহূর্ত্তে হুসেনের সচিবাসন প্রাপ্তি। সহজেই মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন রাজ্যের সর্দ্দারগণ মুজঃফরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, সেই সময়ে হুসেনও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া একদিন রাত্রিকালে রাজগৃহে ষোড়শ জন পাইক পাঠাইয়া মুজঃফরের প্রাণ সংহার করেন। ইহা হুসেন-চরিত্রের দুর্ম্মোচ্য কলঙ্ক! হুসেন একদিকে যেমন বুদ্ধিমান্ সদাশয় কর্ম্মঠ বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তাঁহার উগ্রস্বভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা তাঁহাকে সুখ্যাতির দৃঢ় আবরণে আবৃত রাখিতে পারে নাই। তবে তিনি নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক মুজঃফরের করাল অত্যাচার হইতে নিরীহ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার যশঃকীর্ত্তন ও গুণগান করিয়া থাকেন।

হুসেনের স্থিরবুদ্ধি ছিল না, অধিকাংশ সময়েই পরবুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেন, কখন বা নিজ বুদ্ধিতে দুই একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি চাটুকার ও মদ্যপায়ীকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। দস্যু, তস্কর ও ঠগগণ তাঁহার রাজত্বকালে অতি শঙ্কিত থাকিত। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন ও আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবিতেন। তজ্জন্য প্রজা ও পরিচারকবর্গকে বাধ্য করাইয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। হুসেন হিন্দুবিদ্বেষী বা কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না, এইজন্য তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতন ও

রূপকে আপনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদিতেও তাঁহার আনুরক্তি ছিল না। তাঁহার অধিকার কালে বাংলায় কোনরূপ বিদ্রোহ বা অসন্তোষের অগ্নিকণার চিহ্ন দেখা যায় নাই। মুসলমান রাজত্বকালে রাজ্যশাসনের তাদৃশ কোন শৃঙ্খলা ছিল না। সেই বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি জেলায় জেলায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দেশে বাস্তবিকই একটা শান্তির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মসজিদ, পান্থনিবাস, বিস্তৃত পথ ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন। তিনি উচ্চবংশোদ্ভূত বলিয়া চাঁদপুরের কাজি সাহেব তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে মজঃফর শাহের নিকট প্রথম চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়া ছিলেন।

হুসেনের চারি পত্নী ছিল। তাঁহাদের গর্ভজাত বহু কন্যা হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী বয়স্থা ও বিবাহযোগ্যা হইলেও সমকক্ষ পাত্র না পাইয়া তিনি অতিশয় ভাবিত হইয়া পড়েন। পরে একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁর দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব খাঁর সহিত তাঁহার দুই কন্যার বিবাহ দেন। মদন খাঁ বিষয়ী ও জাতিতে উচ্চ বংশোৎপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং হুসেন সর্ব্বাংশে তাঁহার বংশধরগণকেই কন্যাগণের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া মদন খাঁকে ভয় ও মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া লয়েন। প্রথমতঃ এই ঘটনা লইয়া দেশব্যাপী হিন্দুসমাজের একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পরে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটনাপরম্পরায় আর অধিক আন্দোলন হইল না। ঘটকদিগের কুলজি

পত্রিকায় এইরূপে একটাকিয়ার ২৯ জন রাজবংশধরদিগের জাতিপাতের কথা জানা যায়। তজ্জন্য একটাকিয়ার ব্রাহ্মণ-গণ হিন্দুমুসলমানেরও কুলীন বলিয়া গৌরব লাভ করিয়া ছিলেন; আর বংলার নবাব ও বাদ্‌শাগণ একটাকিয়ার সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণকে কন্যাদান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন এবং জামাতাগণকে উচ্চ বেতনে গৌরবিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। সাধারণতঃ মুসলমান-কুমারীরা সুন্দরী ছিলেন, সুতরাং সৌন্দর্য্যের সর্বজয়িনী ক্ষমতা-প্রভাবে জামাতাদের সহিত কন্যাদিগের সহজেই প্রণয় ও আনুগত্য জন্মিত।

তখন অনেক মুসলমান হিন্দুর কন্যা হরণ করিত। কিন্তু একটাকিয়ার হিন্দুশাখা হইতে তাঁহারা কখনও কোন কন্যা হরণ করেন নাই। বোধ হয় আত্মীয়তারক্ষাই তাহার প্রধান কারণ।

তখন বাংলার অধিবাসীগণ আহারার্থ সুবর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। সামাজিক নিমন্ত্রণকালে যিনি যত অধিক সংখ্যায় সভায় সুবর্ণপাত্র প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনি সাধারণে ততোধিক সম্মান লাভ করিতেন। তখন আধুলি, সিকি, দুয়ানি বা পয়সার প্রচলন ছিলনা। তঙ্কার ব্যবহার ছিল। সেই তঙ্কা ভাঙ্গাইলে এক ঝুড়ি কড়ি পাওয়া যাইত। লোকে তাহার দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিত। ভারতসম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ে তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নী নূরজাহান বেগমই প্রথমতঃ তামার পয়সা প্রচলিত করেন। তাহাতে কিছুই লেখা

বা চিহ্ন থাকিত না এবং সকলের আকৃতি ও ওজন সমান ছিল না। তাহা ঢেপুয়া বা ঢেপুলি নামে আখ্যাত ছিল। এক ঢেপুযার মূল্য কুড়ি গণ্ডা কড়ি। ইহা সকলেই প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাতে রাজকীয় শাসন বা কোন বাধা-বিঘ্ন ছিল না।

পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার পারিজাত-সৌরভে সমগ্র বঙ্গদেশ আমোদিত হইয়াছিল, বেদ বা উপনিষদের চর্চ্চা আদৌ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন বর্ত্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যায় ছাত্রবৃন্দকে ভাবী জীবনের অপ্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতে হইত না। জীবন-নির্ব্বাহের কার্য্যোপযোগী অল্প বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। লোকে বলশালী, রোগহীন, স্বাস্থ্যবান্ ছিল। চোর, দস্যু ও আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সকলেই প্রায় ন্যূনাধিক যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সকলেরই গৃহে অস্ত্রশস্ত্র থাকিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হুসেনশাহের নিকট হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস বার্ষিক বার লক্ষ টাকা কর দানে স্বীকৃত হইয়া সপ্তগ্রাম ইজারা গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে নবাব চৌধুরী নামক এক সমৃদ্ধ মুসলমানের সপ্তগ্রাম ইজারা ছিল। অর্থের প্রলোভন দেখাইয়াই হউক,

বা অপর কোন বিশেষ কারণ থাকুক, হিরণ্য-গোবর্দ্ধন তাহা হুসেনশাহের নিকট হস্তগত করিয়া সপ্তগ্রামের অধ্যক্ষ হইয়া ছিলেন। এই সূত্রে নবাব চৌধুরীর সহিত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পরস্পর একটা অমার্জ্জনীয় মনোমালিন্য ঘটে। নবাব চৌধুরী প্রথমতঃ সপ্তগ্রামের অধিকারশূন্য হইয়া পুনঃ তাহা হস্তগত করিবার বাসনায় বহুচেষ্টা করিয়াও ব্যর্থপ্রয়াস হন। কিন্তু তিনি আত্মগৌরবে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার পুনঃ সে চেষ্টার বিরাম রহিল না। কূটকৌশলী নবাব চৌধুরী এক সময়ে বাদসাহকে বুঝাইলেন যে, হিরণ্যদাস সরকারে ১২লক্ষ টাকা দিয়া ২০লক্ষ টাকা নির্ব্বিবাদে আদায় করিয়া আপনাদের অসংযত ভোগ-বিলাসে ব্যয় করিয়া থাকে। তাহাদের আমোদ-প্রমোদ-কার্য্যাদি দেখিলে বাদ্‌সারও বিলাস-সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। অমনি হুসেনশাহের মন বিচলিত হইল। তিনি নবাব চৌধুরীর বাক্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই নিজ উজিরকে তৎপ্রতীকারার্থে নবাবচৌধুরীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করিবার আদেশ দান করিলেন। নবাব চৌধুরীর মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। তিনি নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া উজির ও অন্যান্য কতিপয় রাজকীয় কর্ম্মচারী লইয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে আপাততঃ বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ সংবাদ উভয় ভ্রাতারই শ্রুতিগোচর হইল। শুনিবা-মাত্র অমনি দুইটী প্রাণী অপমান, নির্য্যাতন ও প্রাণভয়ে দেশ-ত্যাগী হইলেন। যথা সময়ে নবাব চৌধুরী সপ্তগ্রামে উপস্থিত

হইয়াও হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের কোন তত্ত্ব পাইলেন না, তখন তাঁহারা রঘুনাথকে বন্দী করিলেন এবং রূঢ়ভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন স্বরে বলিলেন, শীঘ্র তোমার বাপ-জেঠার সন্ধান বলিয়া দাও। নতুবা তোমার দুরবস্থার একশেষ হইবে।

প্রসন্ন-মধুরমূর্ত্তি রঘুনাথ তাহাতে সঙ্কুচিত বা ভীত হইলেন না। বরং তাঁহার স্বভাবশান্ত প্রকৃতিতে নিরুত্তর থাকিলেন। সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে না ভাবিয়া নবাব চৌধুরী ও রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখিলেন। প্রতিদিনই তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের তত্ত্ব জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি ও যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করা হইত। এমন কি প্রহারোদ্‌যোগও করিতেন। তখন রঘুনাথ স্বীয় প্রশান্তমূর্ত্তিতে অপলকনেত্রে তাহাদের সেই রুক্ষ প্রচণ্ডমূর্ত্তি দেখিতেন। অমনি তাঁহারা নিরস্ত হইতেন।

এইরূপে কয়েক দিন নদীর স্রোতের মত যাইতে লাগিল। একই নাট্যাভিনয়ের ন্যায় তাঁহাদের অভিনয়েরও আর কিছু নূতনত্ব রহিল না। নিত্য একই রঙ্গের অবতারণা। একই বিষয়ের আলোচনা! রঘুনাথও তেমনি নির্ব্বাক্, অটল ও অচল! একদিন সেইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিতেছে, কখন বা এপ্রকারে কার্য্য সফল হইবে না ভাবিয়া নবাব চৌধুরী নম্রকণ্ঠে রঘুনাথের নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন, এমন সময়ে চিরশান্ত রঘুনাথ অতি বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, হে জাঁহাপনা, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হইবেন না। আমি আপনাকে ক্ষমার অবতার বলিয়াই জানি,

বিশেষতঃ আমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত আপনার কনিষ্ঠ দুই সহোদর, ইহাই ভাবি া থাকি। সুতরাং ভাই ভাই কলহবিবাদ কখন শুভকর নহে। আজ আপনি যাহা লইয়া চঞ্চল হইয়াছেন, কালে তিন ভ্রাতায় মিলিত হইলে আপনি নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইবেন এবং তখন নিজকৃত কর্ম্ম বজ্র-জ্বালার ন্যায় বোধ হইবে। আমি পিতার পুত্র হইলেও আপনার পুত্রতুল্য। আপনি আমার পালক, আমি আপনার পাল্য। আপনি আমার পালক হইয়া এরূপ তাড়না করিলে আমি কাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিব? আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ জিন্দাপীর প্রায়, সুতরাং আপনাকে অধিক বলা আমার সঙ্গত নহে।

রঘুনাথের এই অশ্রুমাখা নম্র কথাগুলি শুনিতে শুনিতে নবাব চৌধুরীর বক্ষপঞ্জরের অস্থিগুলি নিঃশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে ছিল। তথা হইতে সহসা একটা বিদ্যুৎ-রেখা তাণ্ডব নৃত্যে খেলিয়া গেল। একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখ-যন্ত্রণার অবসাদে তাঁহার মূর্ত্তি স্থির নিশ্চল হইয়া যাইল। বাকৃশক্তি যেন সংজ্ঞা হারাইয়া নীরবতার মহাপীঠাসন গ্রহণ করিল। আর্দ্র চক্ষের অশ্রু শ্বেত শ্মশ্রু ভাসাইয়া ঝরিতে লাগিল। নবাব চৌধুরী নিষ্পলক নয়নে কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বভাবজাত পুত্রবাৎসল্যরস যেন সহস্রমুখী হইয়া তাঁহার বুকে উথলিয়া উঠিল।

তিনি আর্ত্ত ও কম্পিত স্বরে কহিলেন, বাছারে, আর তোকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছি। আজ হইতে তুমি আমার পুত্র হইলে! তবে বাবা, তোমার বাপ-

জেঠা আমাকে কিছু না দিয়া আপনারাই ৮ লক্ষ খাইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের উচিত—আমাকেও কিছু খাওয়ান। যাহাই হউক, আমি কোনও কথা বলিতে চাহি না। তুমি তোমার জেঠাকে আনাইয়া এই বুড়াটার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও। আমি সকল ক্রোধ শান্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

এতক্ষণ যেন নবাব চৌধুরীর মহিমা মণির দীপ্ত দীধিতি প্রচ্ছন্ন ভাবেই ছিল, আজ রঘুনাথের আকুল প্রার্থনায় সে মণির জ্যোতিঃ প্রকাশ্য ভাবে বিস্ফুরিত হইল। তৎক্ষণাৎ নবাব চৌধুরী উজির ও রাজকীয় কর্ম্মচারীগণকে বলিয়া কহিয়া রঘুনাথের বন্দিত্ব মোচন করিলেন। রঘুনাথও জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য দাসকে আনাইয়া নবাব চৌধুরীর সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। সকল অসরস কূট বিসম্বাদেরই অবসান হইল। নবাব চৌধুরী সাহ্লাদে কয়েকদিন দাস মহাশয়দিগের সংসারে আতিথ্যগ্রহণপূর্ব্বক সুমধুর আত্মীয়তা জাগাইয়া পরে রাজকীয় কর্ম্মচারী সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুখের পরমায়ু অতি সংকীর্ণ। অথবা দীর্ঘায়ু হইলেও তাহার স্থায়িত্ব সংযত বা দীর্ঘ বলিয়া অনুভব করা যায় না। সুখ যে সরলতা দিয়া তাহার স্মৃতি যে টুকু সময় রাখিতে পারে,

দুঃখ সেই সবলতার বিনিময়ে দুর্ব্বলতা দিয়া তাঁহার স্মৃতি সহস্রাধিক কাল প্রস্তরখোদিত রেখার ন্যায় রক্ষণে বিলক্ষণ পটু বলিয়া বোধ হয়। রঘুনাথ যখন শ্রীচৈতন্যে আত্মনির্ভর করিয়া চাঁদপুর ছাড়িয়া অজ্ঞাত পথে শান্তিপুরে যান, সেই কয়েক দিনের দুঃখ-স্মৃতি যে ভাবে সাধারণকে জাগাইয়া ছিল, তাহার পর তাঁহার পুনরাগমন হইতে ন্যূনাধিক দুইবৎসর কাল দাস মহাশয়দিগের অবিচ্ছিন্ন সুখের ও আনন্দের স্মৃতি জাগরণাবস্থাতেই সুপ্ত হইয়া পড়িল।

বাহ্যবিষয়ী রঘুনাথ একদিন শুনিলেন, দয়ালঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দসহ কলিকাতার চারিক্রোশ ব্যবধানস্থিত পানিহাটী গ্রামে আসিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবল বন্যায় দেশ ভাসাইতেছেন। তখন তাঁহার ছদ্মবেশী অন্তর-বৈরাগ্য বাহ্যবিষয় বিপক্ষে বিষম বিদ্রোহী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুদিন সেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় কাহার ভাগ্যে কি ঘটিল, কে হতমান—কেবা শ্রীমান্ হইল, কিছুই জানা গেল না। কিন্তু কয়েক দিন মধ্যেই দেখা গেল, রঘুনাথের সেই চিরদীপ্ত মুখমণ্ডল ক্রমেই যেন ম্লান হইয়া যাইতেছে। তিনি সহসা সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, চিন্তাগ্রস্ত ও বিষয় কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেন। মনোবেদনা তাঁহাকে যে তাড়না করিতেছিল, তাহার নিদর্শন চোখের জলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। তিনি কখন নির্জ্জনে শিশু-চরিত্রের ন্যায় হাসিতেন, কখন বা কাঁদিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনা-

কাঙ্ক্ষায় তিনি যেরূপ চঞ্চল ও অধীর হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তাহাপেক্ষা অস্থির হইয়া উঠিলেন। লোকসঙ্গ আদৌ আর তাঁহার প্রিয়বোধ হইল না। নিঃসঙ্গ হইলেন। তাই একদিন রেবতী অভিমানে আরক্তমুখে অশ্রুসিক্ত নেত্রে রঘুনাথকে ধরিয়া বসিল, কেন তোমার কি হয়েছে বলনা? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী ছাড়া আর ত কেউ নই! সুখের সময় আমি তোমার সুখের ভাগিনী হইতে পারি আর দুঃখের সময় কি এত দুর্ব্বলা যে—সে দুঃখ আমি সৈতে পার্‌বনা?

রেবতীর ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া রঘুনাথ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। রেবতী নিজ অঞ্চলে তাঁহার প্রস্থত-অশ্রু মুছাইয়া বিনীত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি বল, আমার দিব্য,—কেন তুমি এত বিমলিন থাক! নির্জ্জনে বসে কি ভাব? কেন তোমার কি হয়েছে?

রঘুনাথের মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল! ভাবনা—রেবতীকে কি বলিবেন? সে কাহিনী সরলা আত্মত্যাগিনী রেবতীর পক্ষে যে বক্ষঃপঞ্জরভেদী, কঠোর ও মর্ম্মঘাতী।

"বিধাতার কোন অভিশাপে সে এই পাপাত্মাকে বরমাল্য প্রদান করিয়া ছিল" তাহাই রঘুনাথের প্রধান চিন্তা প্রসঙ্গ। "যে সুখে ও দুঃখে ছায়ার ন্যায় অনুসঙ্গিনী, সে মন্দভাগিনীকে তিনি কেমন করিয়া মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিবেন" তাই ভাবিয়া রঘুনাথ চক্ষুর জলে ভাসিতে লাগিলেন। গোধূলির রক্তিম আকাশের মত

তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া রেবতী আরও অধীর হইল। সে স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পাড়ল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর। আমি নিশ্চয় কোন দোষ করেছি, হয় ত মিথ্যা মত্ত-অভিমানে কোনও সময়ে কোন অপ্রিয় কথা বলেছি বা অপ্রিয় ব্যবহার করেছি! তুমি নিশ্চয় আমার সেই অপ্রিয়ব্যবহারে সন্তুষ্ট হওনি। হৃদয়ের দেবতা, ক্ষমা কর! শ্রীচরণে স্থান দাও। আমার প্রতি প্রসন্ন হও! কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হয়োনা।

সে মর্ম্মান্তিক বিনয়ে পাষাণও গলিয়া যায়, তখন রঘুনাথ ত রক্ত-মাংস অস্থিগঠিত কোমল-চর্ম্মাবৃত মানুষ! রঘুনাথ সাগ্রহে রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া আবেগে প্রাণের কথা বলিবার উদ্‌যোগ করিলেন, কিন্তু অধরোষ্ঠ দিয়া সে স্বর বাহির হইল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষাদের মলিন ছায়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠশক্তি কে যেন হরণ করিল। রেবতীরও তখন স্নিগ্ধ কোমলমূর্ত্তি শুষ্ক। তাহার কনককান্তি যেন সন্ধ্যা-পদ্মের মত বিষণ্ণ। অনেক ক্ষণ সে কোন কথা কহিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে রঘুনাথ রেবতীর দক্ষিণ হস্তখানি বক্ষসংলগ্ন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, প্রাণাধিক প্রিয়তমে! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে ক্ষমা কর। হায় আত্মত্যাগিনি সরলে! এতদিনও জাননা যে, কে কাহাকে মার্জ্জনা করবে?

তখন রেবতীর মূর্ত্তি প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্পন্দহীন!

রঘুনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, রেবতি! এমনি দুর্ভাগ্যে আমি, আমা হতে তুমি একদিনও সুখিনী হলে না। বরং— এই বলিয়া রঘুনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রেবতী তাহাতে বাধা ও নিজকে সহস্র ধিক্কার দিয়া একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার কণ্ঠে কহিল, থাক্ থাক্ আর ব'লোনা। সব বুঝেছি, তুমি যে কর্ত্তব্যকে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করে নিয়েছ, আমি কি তাতে প্রভু, কোন দিন কোন বাধা দিয়েছি?

"আমি ত মানুষ, রেবতি" এই বলিয়া রঘুনাথ অতি অল্প সময় মৌন থাকিয়া আবার কাতরকণ্ঠে কহিলেন, রেবতি! আমি তারি জন্য এত ভাবি! তুমি আমার জন্য নিজের স্বার্থ বলিদান করেছ, আপন ঐহিক সুখ দ্বিধাহীনভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছ, আমাকে সর্ব্বস্ব দান করে, আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে হারিয়ে কাঙালিনীর সাজে আমারই প্রত্যাশী হয়ে রয়েছ, আর আমি—

রেবতী আবার রঘুনাথের কথায় বাধা দিয়া অপ্রবীণা হইয়াও প্রবীণার ন্যায় বলিল, 'আর আমি' কি? তুমি কি অপরাধ করেছ প্রিয়তম! অপরাধিনী বরং আমি! আমিই তোমার বন্ধন। তুমি মানুষের কর্ত্তব্য-পথে এই ভোগের মধ্যেও ত্যাগ স্বীকার করে দৃপ্ত বীরপুরুষের মত চলে যেতে চাচ্চ, আর আমি আমার স্ত্রীসুলভ প্রগল্‌ভ অত্যাচারে তোমায় চঞ্চল করে তুল্‌ছি, আমিই ত অপরাধের বোঝা মাথায় করেছি প্রাণাধিক! না, আর অপরাধ কর্‌বো না। তুমি এতদিন হৃদয়াসনে যে প্রাণের অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রাণের প্রিয়তম বস্তুকে উপহার দিতে প্রস্তুত হয়েছ, আজ

স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে নিঃশব্দে তা সমাধা কর। আমার জন্য তুমি ভাব্‌ছ কেন? তোমার ভাবনা আর আমার ভাবনা কি পৃথক্‌!

তখন রঘুনাথের হৃদয়ের তারগুলি একটা বৈদ্যুতিক সঞ্চালনে নাচিতেছিল! একটা অব্যক্ত নিবিড় আনন্দের শিহরণ আসিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিতেছিল। দৃষ্টিতে রেবতীর মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন না, যেন একটী বরাভয়ং করা প্রসন্নবদনা অমর উজ্জ্বলতার সজীব প্রতিমা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সেই সঙ্কট-সিন্ধুর জল হইতে কূলে তুলিতেছিল। তিনি অনন্ত বসুন্ধরা মধুময় দর্শন করিতে লাগিলেন। ললিত ছন্দের সুরে কাহার আহ্বান-সংগীত যেন শুনিতে পাইলেন, অমনি কহিলেন, কে তুমি আমার প্রসন্না দেবীমূর্ত্তি! বাহ্যচেতনহীন রঘুনাথ পরক্ষণেই আত্মসংযত হইয়া পুনঃ কহিলেন, হায় রেবতী আমার কোথায়?

রেবতী তখন বিহ্বল রঘুনাথকে সযত্নে ধারণ করিয়া বিষাদ-মিশ্র কাতর স্বরে কহিল, তুমি আমায় কি এখনও দূরে দেখ্‌ছ? এত দূরে রেখেছ? আমার যে সর্ব্বস্ব তুমি! ভাগ্যবতী রেবতীকে দেখ্‌তে পাও না? এই যে আশ্রিতা দাসী তোমার! এই যে পদের রেণু তোমার!

"হে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, সহায় হ'ন, হে নিত্যানন্দ প্রভু, কৃপা করে আমার উপায় কর", বলিয়া রঘুনাথ স্তিমিতনেত্রে কি এক ভাবানুরাগে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একটী রত্নবেদির আরাধনীয় শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের লালসায় দাস-মহাশয়দিগের গৃহের দুইটী প্রাণী আজ সাগ্রহে ভোগবিলাসের বিস্তৃত পুষ্পময়ী আঙ্গিনা উত্তীর্ণ হইয়া ত্যাগের কঙ্কর-বালুময় স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও প্রাণের সকল ভালবাসার অনবদ্য নির্ম্মল নৈবেদ্য সাজাইয়া সেই অভীষ্ট দেবতার চিরপূজার নিমিত্ত উভয়েই প্রস্তুত। সুতরাং উভয়েরই চিত্তগতি একমুখিনী। উভয়েই ধন্য! উভয়েই কৃতার্থ! তাঁহাদের হৃদয়ে একই সুরে জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতময় গান একই বোধন-বাদ্যে বাদিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া একই স্বপ্নরাজ্যের সৌন্দর্য্য দিয়া অবিশ্রাম আনন্দে খেলিতেছিল! একটা পবিত্র উৎসব-আরতি শ্রদ্ধা-ভক্তির ধূপ-দীপের গন্ধ লইয়া সেই বাদ্য আমোদিত করিতেছিল। তাঁহারা উভয়ে তাহাতে আত্মপ্রাণ ঢালিয়া বিমূঢ় হইয়া ছিলেন।

একদিন অতি নিশীথ কালের কথা—রেবতী একখানি মৃগ-চর্ম্মের আসনে উপবিষ্টা ও রঘুনাথ-প্রদত্ত ইষ্টদেবতার নাম-জপে নিমগ্না। রঘুনাথ অদূরে কুশাসনে বসিয়া তন্ময়ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মধ্যানে নিরত। রেবতীর নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক জপ শেষ হইলে কহিল, দিন চলে যাচ্চে, নিত্যানন্দ প্রভু আর কতদিন পানিহাটে থাক্‌বেন?

রঘুনাথ ধ্যানান্তে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সোৎসাহে কহিলেন,

দিন্‌-ত যাচ্চে রেবতি, কিন্তু দীনের এ দিন ত আস্‌ছে না। কয়েক দিন হ'তেই যাবার মনঃস্থ করে সুযোগ-মুহূর্ত্ত অন্বেষণ কর্‌ছি, কিন্তু মহাপ্রভু ত সে মুহূর্ত্ত দান কর্‌ছেন না।

রঘুনাথের একটী তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, পিতৃনিযুক্ত প্রহরীরা সতর্ক হয়েছে। তারা দুই তিন দিন আমাকে বাধাও দিয়েছে। এখন পিতার মত নিয়ে নিত্যানন্দপ্রভুদর্শনে যাবার ইচ্ছা করেছি; বল দেখি, তাতে তোমার মত কি ?

"তোমার মতের বিরুদ্ধ মত আমার কি আছে প্রভু" !

"মত না বল্‌তে পার, সদ্‌যুক্তি কি না, জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম" !

"যুক্তি মন্দ কি ? কিন্তু তাতে যাবার মত হলেও মায়ের কি মত হবে" ?

"তুমি একটু চেষ্টা কর্‌লে কি হ'ত বলা যায় না"।

রঘুনাথের এই অবিচারের কথাটা রেবতীর বুকে বীরনিক্ষিপ্ত শরের মত বিঁধিল। সে নিরুদ্ধনিশ্বাসে নম্রস্বরে বলিল, এ কথা বল্‌বার আগেই আমি তোমার ব্যগ্র অবস্থা বুঝে একদিন মাকে বলেছিলুন।

"মা কি বল্লেন" ?

"একপুত্রা মাতার সর্ব্বজয়ী স্নেহ অটল পাহাড়ের মত। তাকে নড়াবার শক্তি রেবতীতে কুলাল না। তিনি "পাগল মেয়ে" বলে যেরূপ শুষ্ক হাসিতে আমার পানে চাইলেন, তাতে আমার চেষ্টার হাত পা ভেঙে গেছে"।

রঘুনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিষণ্ণ প্রাণে কহিলেন, তাহ'লে উপায় কি রেবতি ! হৃদয়ের সকল অঙ্কুরিত আশাই ধ্বংস হয়ে যাচ্চে ! দিন এভাবে গেলে আমাকে যে ব্যর্থপ্রাণ উন্মাদ হতে হবে রেবতি !

ব্যথিতা রেবতী অমনি সকল ভুলিয়া রঘুনাথের আকুলতায় আপনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। কোমলকণ্ঠে কহিল, আমিও তাই ভাব্‌ছি, কিসে তোমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, কিসে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা তৃপ্তির সঙ্গে পূর্ণ হয়, আমারও ত তাই বাঞ্ছনীয় প্রিয়তম ! তবে এতে মা যে কেন অমত কর্‌ছেন, বল্‌তে পারি না, তুমি ত আবার আস্‌বে ?—

রঘুনাথের হৃদয়াভ্যন্তরের সপ্তস্বরা বীণার সমস্ত তারগুলি যেন ঝঙ্কার দিয়া একত্রে একেবারে ছিঁড়িয়া যাইল। তিনি চমকিত হইয়া কহিলেন, আবার আস্‌বো, এ কথার তাৎপর্য্য কি রেবতি ! আর আমি যদি সে সঙ্গ ত্যাগ করে না আসি, তাহলে—

"তাহলে একটুকু চিন্তা-ভাবনার কথা বটে" ! রেবতীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। জগতের সহিত তাহার কোন সংস্রব আছে কিনা, তাহা সে ধারণায় আনিতে পারিতে ছিল না। রেবতী, ভাবে নাই যে, তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব তাহাকে চিরকালের মত সম্পার্কশূন্যভাবে দূরে রাখিয়া নিজবাসনা কৃতার্থ করিবেন। সে ভাবিয়াছিল, তিনি পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন সকলেরই বাসনা পূর্ণ করিবেন, তখন তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে যাইবার আবশ্যক কি ! তাই রেবতী সেই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া অবনত-

প্রাণে স্বামীর সাধু-কার্য্যে সহযোগিনী ও সহচারিণী হইয়াছিল। এইটুকু মনের বল এবং ধর্ম্মভাবও যে অসাধারণ ও অলৌকিক! তাহার পর সে যাহা শুনিল, তাহাতে কোন্ রমণী সে ত্যাগ স্বীকারে স্বীকৃতা হইতে পারে? সংসারে সুখৈশ্বর্য্য কামনা তুচ্ছ হইলেও কয়জন শক্তিধর তাহা ত্যাগ করিতে শক্তিমান্? যে মানুষ জগজ্জননীর নিকট "রূপং দেহি ধনং দেহি" বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই মানুষের এইরূপ স্বার্থত্যাগ, ইহা কোন্ ভক্তির স্তর; তাহা আমাদের সসীম ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় না। রেবতীর হৃদয়ের শূন্যতা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে বুকের ব্যথা মুখে চাপিয়া কহিল, সত্য কি তুমি আর ফিরে আস্‌বেনা?

"যদি না আসি, তাই বল্‌ছিলুম"—

সে কথায় বাধা দিয়া রেবতী ম্লানমুখে কহিল, তাহলে আরও কয়েক দিন থেকে যাও। মনটাকে বাঁধ্‌তে পারি কি না, চেষ্টা করি।

দেখা গেল, তখন রেবতীর মুখে দৃঢ় উদ্যম ও সংযম-রশ্মি স্পষ্ট খেলিতেছিল।

রঘুনাথ প্রেমকণ্ঠে কহিলেন, অপরাধীর অপরাধ নিওনা লক্ষ্মীটী আমার। তুমি যে মূর্ত্তিমতী শক্তি। তোমাতে সব সম্ভবে। তুমি ত ক্ষুদ্র নও! এত ত্যাগ কর্‌তে পেরেছ, আমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনী সেজেছ, ভোগ-বিলাসের কোমল সঙ্গ অবহেলায় নির্ব্বাসন দিয়েছ, আর এইটুকু পার্‌বেনা—যে টুকুর সম্বন্ধ জীবনাবধি!

রেবতীর গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল! চক্ষের পাতা অশ্রু-সিক্ত হইল। তাহার দুর্ব্বল প্রাণ কোন নিভৃত আশ্রয় লইতে বিব্রত হইয়া পড়িল!

রঘুনাথ রেবতীর সেই উদ্দাম অবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিলেন, রেবতি! ভাবিত হয়ো না, আমি নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে পুনর্ব্বার গৃহেই ফির্‌ব। যতদিন না তুমি মনঃ দৃঢ় কর্‌তে পার্‌বে, যত দিন না মা বাবা আমার ভবিষ্য বিরহ সহ্য কর্‌বার শক্তি লাভ কর্‌বেন, ততদিন গৃহেই থাক্‌ব। তুমি এখন হ'তে প্রস্তুত হ'তে থাক। তুমি পারবে, তুমি ছোট নও।

রেবতী আর সেখানে তিলার্দ্ধও থাকিতে পারিল না। সলজ্জ মিষ্ট হাস্যে প্রদীপের বর্ত্তিকাটা উস্‌কাইয়া দিয়া প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল প্রদীপালোকে রঘুনাথ দেখিলেন স্বর্গসুন্দরী রেবতীর নির্ম্মল মুখখানি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বিদ্যুদগ্নির ঝলকে বিমণ্ডিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পুত্রস্নেহান্ধা বিজয়া গর্ব্বিতস্নেহে বলিতে ছিলেন, আরও বিশ্বাসী বলবান্ প্রহরী নিযুক্ত কর। রঘুকে তারা চোখে চোখে রাখুক। যেন সে কোন রূপে পালাতে না পারে। সে পাগল হয়েছে, তাকে নয় বেঁধে রাখ।

গোবর্দ্ধন ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, রঘু পাগল নয় বিজয়া, পাগল তুমি। যার মত্ত মনকে পিতামাতার অপূর্ব্ব স্নেহে, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যে ও অপ্সরাপ্রতিম পত্নীর প্রেমে বাঁধতে পার্‌লে না, তাকে তুমি তুচ্ছ রজ্জু-বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌বে?

পুনর্ব্বার গোবর্দ্ধন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বিজয়া, রঘুকে কিছুতেই গৃহে রাখা যাবে না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সত্যই তাকে কৃপা করেছেন। তাই সে রঘু আমার প্রভুর পাগল। বিজয়া! যে প্রভুর পাগল, তাকে কে বেঁধে রাখ্‌বে। এমন শক্তি কার? তার চেয়ে বরং তার অনুকূল মতের পোষকতা ক'রে যতদিন তাকে নিকটে রাখ্‌তে পারা যায়, তাই বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ পথ! সে নিত্যানন্দঠাকুরের নিকট যায় যাক্, তাতে আর বাধা দিয়ে কাজ নি!

নারী-মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পতিপ্রাণা বিজয়া স্বামীর কথায় সম্মতি দান করিলেন। যেদিন গোবর্দ্ধন বিজয়ার সহিত বাদানুবাদের পর স্থির করিলেন যে, রঘুকে নিত্যানন্দ-ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার অনুমতি দানই সুসঙ্গত, সেই দিন রঘুনাথও রেবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন, অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার দিয়া সেই নিশীথেই তিনি পানিহাটিতে পলায়ন করিবেন। সহধর্ম্মিনী রেবতী সেই গুপ্তদ্বারের রুদ্ধ কপাটের অর্গল মুক্ত করিয়া রাখিবে; তাই রঘুনাথ নিত্যানন্দঠাকুরের মিলন-পিপাসায় দিবাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রেবতী ও স্বামীর সেই নিষ্ঠুর বাসনা সার্থক করিতে

নিজে ধৈর্য্য-প্রতিমার মত একটা অকাট্য মীমাংসার ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

অপরাহ্ণ হইল! সন্ধ্যাদিগন্তের মসীপুঞ্জ শ্রেণীবদ্ধ তরু-রাজির নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া দাস মহাশয়দিগের সমুজ্জ্বল গৃহপ্রাঙ্গণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে সারাদিনের বৈষয়িক-কর্ম্মক্লান্ত গোবর্দ্ধন বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিলেন। আসিয়াই সস্নেহে মধুরকণ্ঠে রঘুনাথকে আহ্বান করিলেন। সে আহ্বানে কোমল-স্বভাব রঘুনাথের মনে যুগপৎ ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তিনি দুই তিন বার পিতার অসম্মতিতে পানিহাটে পলাইবার বিশেষ চেষ্টা আয়োজন করিয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সতর্ক প্রহরীরা তাঁহাকে পথ হইতে ধৃত করিয়া আনে। তাই পিতৃ-আহ্বানে রঘুনাথ আপনাকে অপরাধী বিবেচনায় শিহরিয়া উঠিয়া নতমস্তকে ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃপদ বন্দনা করিয়া আহ্বানের কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

গোবর্দ্ধন পিতৃবৎসলতার সজীবমূর্ত্তি রঘুনাথকে বিষাদিত দেখিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, বাবা রঘু, তোমাকে দিন দিন অতিশয় মলিন হতে দেখ্‌ছি? তুমি কি নিতান্তই নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে যাবে?

রঘুনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল। একটা গভীর উচ্ছ্বাস তাঁহার বুকে ঘূর্ণিবায়ুর মত ছুটিতে লাগিল। তিনি কোন উত্তর

দিতে পারিলেন না। পুত্রস্নেহ-কাতর গোবর্দ্ধনের কোমল বক্ষেও পুত্রমনোবেদনার প্রবলপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি সজলনেত্রে রঘুনাথের মস্তক বুকের মধ্যে চাপিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, বাবা, তুমি এখন বালক, জান না পিতৃপ্রাণ কত দুর্ব্বল। পুত্রের পিতা হইলে বুঝিবে, সন্তান পিতার কি অমূল্য আদরের বস্তু। আরও জানিবে, পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলে পিতার কত আনন্দ! সেই পুত্র তুমি, আমার বংশের একমাত্র মাণিক, আমরা দুভায়ে তোমারই মুখ চেয়ে এ সংসারে রয়েছি। তোমার মাতারও অবস্থা তাই। তুমি আমাদিগে যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যাও, সেই ভয়ে আমরা তোমাকে প্রহরীবেষ্টন করে রেখেছি। কিন্তু তাতেই কি আমরা সুখী বাবা! তোমার চন্দ্রমুখ মলিন দেখ্‌লে আমরা চঞ্চল হয়ে পড়ি! এ কুবের-ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়।

কি মধুর স্নিগ্ধ স্বর! পিতৃভক্তিতে রঘুনাথের অন্তর-বাহির ভরিয়া যাইল। তিনি অতীত-বর্ত্তমান আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যেন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে আপনাকে অতি দীন অকিঞ্চন বলিয়া বোধ করিলেন। কি দিয়া পিতৃভক্তির আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহা এই বিশাল বসুন্ধরায় খুঁজিয়া না পাইয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ক্ষোভোত্তেজিত স্বরে বলিলেন—বাবা, পুত্রের অপরাধ ত পিতার নিকট চির মার্জ্জনীয়।

"সত্য বাবা, কিন্তু পুত্র যদি "ত্যাজ্যপিতা" করে, তাহলে—"

গোবর্দ্ধনের বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতে রঘুনাথ পিতার পদে লুঠিয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন অমনি সস্নেহে রঘুনাথকে তুলিয়া বাহুবেষ্টনপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার অপরাধ কিছুই নেই রঘু! দুর্ব্বল-চিত্ত আমরা অন্যের ত্রুটী পদে পদে লক্ষ্য করি। যাক্, আর আমরা তোমাকে নিত্যানন্দ-দর্শনে বাধা দিয়ে রাখ্‌ব না। তুমি স্বচ্ছন্দপ্রাণে—তোমার কামনা পূর্ণ কর। তবে একটী অনুরোধ, প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘরে ফিরে এস। আমি তোমার পিতা, আমার নিকট বল, ঘরে ফির্‌বে?

রঘুনাথ পুলকিত প্রাণের তীব্র আকুলতায় নতমস্তকে তাহাই স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, আজই কেন যাই না বাবা! আপনি যাবার আজ্ঞা করুন। পুত্রের আকুলতায় পিতা চকিতচেতনচিত্তে বিস্ময়বিমূঢ় গম্ভীর স্বরে কহিলেন, সম্মুখে কৃষ্ণপক্ষের কালরাত্রি! প্রত্যূষের প্রতীক্ষা কর বাবা!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ সারারাত্রি ব্যাকুলপ্রাণে বিনিদ্রভাবে কোনরূপে অতিবাহিত করিলেন। স্নিগ্ধ-কিরণরঞ্জিতা ঊষা পূর্ব্বদিকের নীললোহিতাভ আকাশের ক্রোড় হইতে নামিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। ঐ সঙ্গে দুই চারিটা পাখী ঊষার আগমন সংবাদের চর্চ্চা করিতেছিল। রঘুনাথ ব্যস্তভাবে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

দূরদর্শী গোবর্দ্ধন ও তাঁহার পত্নী বিজয়া পূর্ব্বরাত্রেই পুত্রের বিদেশগমনোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যাইবার জন্য ভীমকায় বলিষ্ঠ কপির ভাম রাধানাথ ভৃত্যকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া ছিলেন। রাধানাথকে আরও বলিয়া রাখিয়া ছিলেন, "জানিস রাধানাথ! তুই রঘুর সঙ্গে যাবি, কাছে কাছে থাক্‌বি" আর যদি জিজ্ঞাসা করে,"তুমি এলে কেন" তাহলে বল্‌বি, "দাদামহাশয়ের সঙ্গে প্রভুকে দেখ্‌বার জন্য" ইত্যাদি— রাধানাথ তাই অতি প্রত্যূষে ধনবানের ভৃত্যেরই মত বেশ সাজিয়া-গুজিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল। এদিকে রঘুনাথ অতি অল্পসময় মধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পিতৃপদ-বন্দনার উদ্দেশে পিতার কক্ষাভিমুখে যাইতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদূর যাইতে হইল না, অর্দ্ধপথেই রঘুনাথের পদশব্দেই গোবর্দ্ধন ও বিজয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন উভয়ের চারি চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। ব্যস্তভাবে রঘুনাথ "বাবা, তবে আমি আসি" বলিয়া কায়মনঃপ্রাণে সভক্তি পিতা-মাতার পদধূলি লইলেন এবং মনে মনে "আমার বাসনা যেন পূর্ণ হয়" ভাবিয়া তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

বিজয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, দেখিস্ বাবা রঘু. যেন বিলম্ব না হয়: আমি চাতকীর মত তোর আশা-পথ চেয়ে রৈলুম। রঘুনাথ উদ্বেগ-শঙ্কিতা মাতার মুখের পানে চাহিয়া ভক্তিগদগদ-স্বরে কহিলেন, না মা, বিলম্ব হবে না। আমি একথা জেঠাইমাকে কালও বলেছি, আজও বলে এসেছি।

বিজয়া কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। গোবর্দ্ধন আপন অভীষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

রেবতী তখন সকলের অলক্ষ্যে গবাক্ষের অন্তরাল হইতে প্রত্যাশিত দৃষ্টিবিনিময়ের আশায় উৎসুকদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিতেছিল, কিন্তু আত্মবিভোর রঘুনাথ, তখন বাহ্য দৃষ্টি হারাইয়া ছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির কার্য্য করিতে ছিলনা; অন্তরের কাম্যবস্তুই দর্শন করিতে ছিল।

তিনি দ্রুতপদে অন্তর্ব্বাটী হইতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। অমনি রেবতীর একটী উষ্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। সে তখন আপনাকে দুর্ভাগ্যবতী বা সৌভাগ্যবতী বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। একদিকে ভোগের বাঞ্ছা যেমন তাহাকে অতি দীনা, হীনা ও চিরদরিদ্রা বলিয়া, ব্যঙ্গ করিতে ছিল, অপর দিকে ত্যাগের দীক্ষা তেমনি তাহাকে পূজার রত্নবেদিতে বসাইয়া ভাগ্যবতী সম্বোধনে দেবীসম্মানে সম্মানিত করিতেছিল। তাই সে সেই সন্ধিক্ষণে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "যাহা হউক, আমার অদৃষ্টলিপি ত খণ্ডিবার নহে। তখন কাহার প্রতি দোষারোপ করিব? সুখ কোন্‌টায়? ভোগে না ত্যাগে?

মানুষ যখন ভোগের অভাবে জ্বলিতে পুড়িতে থাকে, তখন তাহার মনের অবস্থা এইরূপই হয়। এত সে চঞ্চল হইয়া পড়ে যে, পরে একটাকে আশ্রয় করিয়া লয়।

রাধানাথ পূর্ব্ব হইতেই রঘুনাথের অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখীন দেখিয়া—যদিও রাধানাথ রঘুনাথ

অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, তথাপি—ভক্তিস্বরে কহিল, দাদামশায়, বেরিয়েছেন কি?

অভীষ্টসাধনে তন্ময় রঘুনাথের কর্ণকুহরে রাধানাথের সে ভক্তি-প্রশ্নের কোন বর্ণ প্রবেশ করিল না। তিনি ভাব-বশে আপন মনে নিরুত্তরে চলিতে লাগিলেন দেখিয়া রাধানাথ গাঁটরী মাথায় করিয়া তাঁহার অনুযাত্রী হইলেন। রঘুনাথ অতি দ্রুতপদেই চলিতে ছিলেন। রাধানাথ বলবান হইলেও রঘুনাথের পশ্চাৎবর্ত্তী হইবার জন্য তাহাকে বেশ একটু শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত পরস্পর কোন সম্বন্ধ বা সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হইতে ছিলনা। রাধানাথ প্রভু গোবর্দ্ধনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের নিমিত্ত নীরবে ও নির্ব্বিচারে রঘুনাথের পদানুসরণ করিয়া চলিতে ছিল।

ক্রমে নব প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক প্রখর হইয়া উঠিল। পুণ্যপূত সবিতা যেন পাপকলঙ্কিত পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া অসন্তুষ্টির তীব্র কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার নিকট হইতে দূরে যাইতে ছিলেন। রাধানাথ দ্রুত পদক্ষেপের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু রঘুনাথ অক্লান্তভাবে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দৈহিক শক্তির আয়তন অপেক্ষা মনের শক্তির আয়তন অনেক বৃহত্তর হইয়াছিল। সে শক্তির মূল অপর কিছুই নহে, প্রাণের একান্ত আকুলতা। যাহাই হউক, রাধানাথ রঘুনাথের অনেক পশ্চাতে পড়িল দেখিয়া অগত্যা সে উচ্চৈঃস্বরে "দাদামশায় একটু দাঁড়িয়ে যাবেন" বলিয়া বারম্বার চীৎকার

করিতে লাগিল। সে রুক্ষ আহ্বানেও রঘুনাথের দৃক্‌পাত নাই।

সে পথে যে সকল পথিক যাইতে ছিল, তাহারা রঘুনাথের ভাব গতিক দেখিয়া ভাবিল, "লোকটা পাগল নাকি? নয় এত ডাকেও শুন্‌তে পায় না!"

আবার তাহাদের মধ্যে যাঁহারা হৃদয়বান্ ও পরোপকারী, তাঁহারা বিপন্ন রাধানাথের অবস্থা দেখিয়া রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া "ওহে বাপু, শুন্‌তে পাচ্চনা? একটু দাঁড়িয়ে যাও না। তোমার সঙ্গের লোকটা কি বল্‌ছে শুন ইত্যাদি বাক্যে মিলিত-উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

সহসা রঘুনাথের মনোবৃত্তি যেন ভাবজগৎ হইতে কর্ম্ম-সংসারে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। তিনি পশ্চাৎ জনমুখরিত দিক্ অবলোকন করিতেই দেখিলেন, ঘটনাটা কি জলন্ত ভাবে সাক্ষাৎ করিতেছে। তাহাতে তাঁহার মন যেন শত-ভগ্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রথম চিন্তা আসিল, "বাটীর বিশ্বস্ত প্রিয় ভৃত্য রাধানাথ দাদা সম্ভবতঃ তাঁহাকে ঠাকুর নিত্যানন্দ দর্শনে বাধা দিতে আসিতেছে।" আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, "না, পিতার অনুমতি লইয়াই ত আসিয়াছি। তাহাও ত সম্ভব নহে। তবে কি বাটীতে কোন মঙ্গলগ্রাসী সাংঘাতিক বিপদের বিদ্যুদগ্নি আমার সকল আশালতা ভস্ম করিতে ক্ষিপ্রবেগে এতদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে?

রাধানাথ ক্রমে যত রঘুনাথের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,

রঘুনাথের মনের স্তরও তত জীর্ণ, বিদীর্ণ ও শত ক্ষত হইতেছিল। অল্প সময় মধ্যেই রাধানাথ রঘুনাথের সম্মুখীন হইয়া আপন বুদ্ধি-গত একটু সরস ভাব সংযোজন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, দাদামশায়ের যে চলা অভ্যেস, তাতে আমি হেন রাধানাথ— আমাকেও হার মান্‌তে হয়েছে।

রাধানাথের বাক্যে রঘুনাথ তখনও আপনার মনের কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত ভাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভাবনা—"এই বুঝি রাধানাথ দাদা আমার কৃতার্থকামনার বিরুদ্ধে বিকৃত অকল্যাণীয় কথা উত্থাপন করে।" তাই তিনি ব্যগ্র ও গম্ভীরস্বরে কহিলেন, রাধানাথ দাদা, কি মনে করে আস্‌ছ তুমি?

রাধানাথ তেমনি হাসিতে হাসিতে প্রভুর উপদেশগুলি বেশ গুছাইয়া কহিল, সৎসঙ্গে কাশীযাত্রা কার না ইচ্ছা হয় দাদা-মশায়! আপনি কলির ভগবান নিতাইঠাকুরের ছিচরণ দেখ্‌তে চলেছেন, আর এ পাপীটার একটা উপায় করে দিবেন না? রাধানাথ "শ্রী" শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, তাই সে "শ্রী" স্থানে "ছি" বলিত।

রাধানাথের সাজান কথায় রঘুনাথের বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি গভীর চিন্তা করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ক্লান্ত রাধানাথও একটী অদূর ছায়ায় বসিল।



বিংশ পরিচ্ছেদ।

উভয়ে কথপোকথন হইতে ছিল। রঘুনাথ কহিলেন, সত্য বল্‌বে রাধানাথ দাদা, বাবা তোমায় কি আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য পাঠান নাই?

"না গো না দাদামশায়, তিনি কেন পাঠাবেন। কুঁজোর কি চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে হয় নি গা?

"সে ইচ্ছা কি তার কৃতার্থ হয় ভাই! মনের ইচ্ছা মনেই লুপ্ত হয়ে যায়। সাগরের জল সেঁচা সহজ নয়। তুমি যা বল ভাই, কিন্তু তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্চে না। আমার মন যেন বল্‌ছে, আমার রক্ষক হয়ে যেতে বাবা নিশ্চয় তোমায় পাঠিয়েছেন।"

রাধানাথ একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তবে সে চতুর ও কার্য্যদক্ষ, সহজে দমিবার পাত্র নহে। সে কহিল, না দাদামশায়, আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় হন্যিকুকুরের মত ছুটে আস্‌ছি। কর্ত্তামশায় আমাকে পাঠাবেন কেন?

তখন রঘুনাথ রাধানাথের গাঁটরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাবা পাঠান নি দাদা, তবে তোমার গাঁটরীতে কি আছে দেখ্‌ব।

এই বলিয়া তিনি গাঁটরী উন্মোচনে গাত্রোত্থান করিলেন। রাধানাথ অনন্যোপায় হইয়া কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট

হইল। তবু সে উপস্থিত বুদ্ধি-প্রভাবে কহিল, দেখুন না, ও সব কাপড়-চোপড়-লেপ-বালিশ আপনার, আমি ইচ্ছে করে এনেছি। কর্ত্তামশায় মোটেই জানেন না।

রঘুনাথের সংশয় স্থির হইয়া গেল, তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। একটু ক্ষীণ হাসিয়া অসন্তুষ্টির স্বরে কহিলেন, তবু মিথ্যা বল্‌তে ছাড়্‌বেনা ভাই, তা যা হয় হোক্, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না। রাধানাথ তখন কাতর হইয়া পড়িল ও ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, দাদামশায়, কসুর মাপ করুন। এমন ঘট্‌বে বলে আমি ভাবিনি।

পরদুঃখকাতর বিনীত রঘুনাথ রাধানাথের ম্লানমুখ ও কাতরভাব দেখিয়া ব্যথিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, রাধানাথ দাদা, দুঃখিত হয়ো না। তুমি বাটী যাও।

রাধানাথ আরও কাতর হইয়া বলিল, না দাদামশায়, গরীব-টাকে সঙ্গে নাও। আপনার কষ্ট হবে বলে, ঐগুলো সঙ্গে এনেছিলুম। বুঝ্‌তে পারি নি; ভেবেছিলুম, এ সব ত সেখানে দরকার হতে পারে।

রঘুনাথ ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, না ভাই, সেখানে এ সকলের কিছুই প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন থাক্‌লে কেউ সেখানে যেতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁর কাছে যাবো, তিনি দীনের দয়াল ঠাকুর! নিরতিশয় দীনই তাঁর নিকট আশ্রয় পায়। তুমি ত দেখেছ দাদা, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমি ঐ সকল বিষধর সর্পের বিষের মত ত্যাগ করেছিলুম—যা নিয়ে তুমি

এত কষ্ট করে এসেছ ? যে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত, সে ভোগের জন্য লোভের উপচার সঙ্গে রাখ্‌বে কেন ?

রাধানাথ এসকল কথার বিশেষ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারুক বা না পারুক, তবে সে তাহার অজ্ঞবুদ্ধিতে ইহাই বুঝিল, তাহাকে সঙ্গে লইতে প্রভুপুত্রের বিশেষ কোন আপত্তি বা দ্বিধা নাই; কেবল তিনি দেড়মণী গাঁটরীর বিরোধী। এই পাপটা আনিয়াই সে অনর্থ ঘটাইয়াছে! আরও সে ভাবিতেছিল, কর্ত্তামশায় এমনটা কেন করিল? অনেকক্ষণের পর রাধানাথ বিশেষ চিন্তা করিয়া কহিল, তা—দেশ আমি নয় ঐ পাপগুলো, সেখানে বের কর্‌বো না। পরে ঘরের জিনিষ ঘরে ফিরে নিয়ে গেলেই হবে।

"না, তাও হবে না রাধানাথ দাদা, ও পাপ তোমার সঙ্গে লওয়াই হবে না"।

রাধানাথ বিস্মিতভাবে কহিল, এত টাকার মাল কেমন করে জলে ভাসিয়ে যাবো দাদামশায়!

রঘুনাথ আরও বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, সেখানে যেতে হ'লে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয় রাধানাথ দাদা! তিনি যে তাঁর নিজস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার-আমার অখণ্ডিত সেবার কার্য্যে তন্ময় হয়ে আছেন। আমাদেরই জন্য তাঁর এমন একটুক্ সময় নেই যে, তিনি তাঁর সেই সেবাব্রত ত্যাগ কর্‌তে পারেন। তিনি সেবাব্রত ত্যাগ কর্‌লেই সৃষ্টির মহাপ্রলয়! তাঁর সেবায় এই সৃষ্টি রক্ষিত! জলটা ফুলটা, ত'তে কীটাণু মানব পর্য্যন্ত সকলেই তাঁর সেবার

মুখ চেয়ে রয়েছে। তবে কেন তুমি তাঁর সেবক হবার জন্য এই তুচ্ছ সামগ্রী ত্যাগ করে তাঁকে সেবা করতে চাও না? যিনি তোমার-আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মাতৃবক্ষে স্তন্য দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষার বিধান করেছেন, যিনি চক্ষের অন্তরালে থেকে নিরন্তর আমাদের মঙ্গলের শঙ্খধ্বনি কর্‌ছেন, যিনি আমাদেরই কল্যাণের জন্য দীনের চেয়ে দীন সেজে অযাচিতভাবে আমাদিগে প্রেম দিতে অমিয় প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাচ্চেন! আর তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ যে, নিজের জীবন কৃতার্থ করতে তাঁর সেবক হ'তে প্রস্তুত নও? রাধানাথ দাদা, পরম দয়াল সে, বিরাট উদার সে, অতি সরল অকুণ্ঠিত ভেদহীন সে, সঙ্কীর্ণতা তার কোন স্থানে আশ্রয় পায় না। সে অসীম, কোনও সীমায় বদ্ধ নেই! কেবল সিদ্ধিদানেই আনন্দময়ের পরমানন্দ! তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, জীবের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই তাঁর আনন্দ-ব্রত।

এই ভাবকাহিনী কহিতে কহিতে রঘুনাথের প্রেমার্দ্র-নয়নে তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস ক্রমেই প্রবল হইয়া অবিরাম অশ্রু-ধারায় পরিণত হইতে লাগিল।

রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া রাধানাথের মনে হইতে ছিল, দাদামশায়ের এতগুলা কথার অর্থ এই, দামী জিনিষসকল জলাঞ্জলি না দিলে নিতাইঠাকুর আমাদিগে ভালবাসবেন না। কেমন সে বিট্‌লে ঠাকুর! যে পেটে খাবে না, তাকে তাঁর কৃপা হয়, নৈলে নয়? ভাল যা হোক্, অভাগার পুত বটে। একটু

পরে সে বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িল। রঘুনাথকে কি বলিবে, স্থির করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া কহিল, হাঁ দাদা-মশায়! সত্যি সত্যি কি এগুলো ফেলে দিয়ে যেতে হবে? এ তাঁর কেমন কৃপা দাদামশায়!

রঘুনাথ যে নিরাবিল প্রেমের স্রোতে ভাসিতে ছিলেন, সেই স্রোতের অনুকূলেই বলিলেন, রাধানাথ দাদা, তাঁর কৃপার কথা শুন্তে চাচ্চ? শোন, তাঁর কৃপার তুলনা নাই। তাঁর কৃপা হলে জীবের আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকেনা। ভোগ-বিলাসের কথা মনে আসেনা। আবার জীবের কোন ভোগেরই অভাব হয় না। তিনি যদি বুঝেন, এ সকল ছেড়ে আমাতে আত্মপ্রাণ ঢেলেছে, আমার সেবার প্রতিদানের নিমিত্ত আমার সেবক হয়েছে, তাহলে অমনি তিনি তাঁর বুকভরা তৃপ্তি দিয়ে তার আজ্ঞাকারী হয়ে বসেন। আহা হা, এমনি মধুর করুণা তাঁর! এমনি প্রাণের ভালবাসা তাঁর।

রঘুনাথ চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

রাধানাথ দাদামহাশয় রঘুনাথের ভাবান্তরে উত্যক্ত হইতে ছিল। সে মনে মনে বলিতে ছিল, আচ্ছা দয়ালঠাকুর বটে! তাঁর কৃপায় ক্ষুধা থাকে না, পরতে হয় না, আ মর—যদি তাঁর কৃপায় খাওয়া-পরাই একেবারে উঠে যায়, তাহলে অমন জলজ্যান্ত যমের কৃপায় লাভ কি? তার চেয়ে আমার কর্ত্তামশায় খুব বড় রকমের দয়ালঠাকুর। তিনি যার প্রতি সদয় হন, সে ত রাতারাতি বড়লোক হয়। কৃপা ত সেই! মহাশয় লোক ত

সেই। তা দাদামশায় আমার কাকে কি বল্‌চেন, তা ত আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। যাক্, কর্ত্তামশায়ের হুকুম দাদামশাইকে চোখের আড়াল কর্‌বে না। কিন্তু এত দামী জিনিষগুলো ফেলে দিয়ে গেলেই বা তিনি কি মনে কর্‌বেন? মরুক্‌গে—গোলামের আবার ভাব্‌বার কি আছে! গায়ের রক্ত দিয়ে মনিবের আজ্ঞা বাহাল কর্‌তে হবে। রাধানাথ বহু চিন্তা করিয়া পরিশেষে কহিল, তা এ পাপগুলো একজায়গায় রেখে গেলে হ'তনা দাদামশায়! ফের্‌বার সময় নিয়ে ফির্‌তুম।

রঘুনাথ মহামায়ার মহাশক্তির বিশালতা বহুদিন হইতেই জানিতেন, সেই মোহনী নিঃস্বর ভাষায় বিরাট বিশ্বের শেষপ্রান্তব্যাপ্ত বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ হইতে পশু-বানর-মানব পর্য্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিকে কোন্ অশ্রুত সঙ্গীতে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহা তিনি বৈরাগ্যকে বন্ধুপদে বরণ করিবার পরেই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। এখন যে তিনি তাঁহার আসাগরশৈলবসুন্ধরাবেষ্টিত সুদৃঢ় শৃঙ্খলজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এমন নহে। অহো সে শৃঙ্খল কি দুশ্ছেদ্য! সম্মুখে ভগবদ্দত্ত বিবেকের শাণিত ক্ষুরশাণ অস্ত্র, তাহাতে সে শৃঙ্খল অনায়াসে ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু এমন শক্তির অভাব—যে শক্তি সে অস্ত্রধারণে সমর্থ। যদি কোন শক্তিধর সে অস্ত্রধারণ করিয়া সেই নিষ্ঠুর শৃঙ্খল ছেদনে উদ্যত হয়, অমনি কাম্যভোগেচ্ছা তাহার বিরুদ্ধে সবল আঘাতে তাহাকে পশ্চাৎপদ করিয়া দেয়। জীবের হৃদয় এক রণক্ষেত্র। সেই

ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিত্য সংঘর্ষ ও নিত্য সংগ্রাম। সেখানে সহিষ্ণুর জয় ও অসহিষ্ণুর পরাজয়। যাঁহারা ক্ষণিক সঙ্কীর্ণ আপাত আনন্দে সন্তুষ্টি লাভ না করিতে চান, তাঁহারাই সেই নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল আনন্দ লাভের জন্য তথায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কর্ম্মসংসারে অমল যশঃ ও জয় উভয়ই অর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই নিঃশব্দে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার ভীমগণ্ডা অতিক্রম করেন।

রঘুনাথ রাধানাথের প্রার্থনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন, তুমি ঘরে ফিরে যাও দাদা!

"তা কি হয়গো দাদামশায়!"

"কেন আপত্তি কর্‌ছ ভাই?"

"তা হলে আর প্রভুর দর্শন এ পোড়া অদৃষ্টে ঘট্‌বেনা।"

"তাঁর দয়া হলেই ঘট্‌বে।"

"অধমটার উপরে তাঁর দয়া ঘট্‌বে কেন"?

"অধমতারণ তাঁর যে নাম ভাই! অধমকেই ত তিনি সর্ব্বাগ্রে দয়া করেন।"

রাধানাথ আরও কাতরভাবে কহিল, না দাদামশায়, চাকরটায় ছিচরণে রাখ।

রঘুনাথ অনন্যোপায় হইয়া কহিলেন, তা হ'লে একান্তই তোমায় যেতে হবে?

"হাঁ দাদামশায়, আপনার সঙ্গে না হলে আর ঘট্‌বে না"।

"তাহলে ও পাপ বোঝার মায়া কর্‌ছ কেন!"

"মনে ত করি কর্‌বনা, তবু যে মন কেমন কেমন করে দাদা-মশায়।"

"বেলা হয়ে যাচ্চে, তুমি যা কর্‌বার তা কর, কিন্তু ও পাপ বোঝার মায়া ত্যাগ করতে হবে। আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ছিনা" বলিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইলেন।

রাধানাথের কোন চাতুরী সফল হইল না। তখন তাহার চিন্তা-ইতিহাসের কোন বর্ণটী অকরুণাত্মক বলিয়া বোধ হইতে ছিল না। রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলেন। তেমনি ক্ষিপ্র গতি! তেমনি ভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি! তেমনি তিনি রাধানাথকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমেঃ দূরবর্ত্তী হইলেন। রাধানাথের কান্না আসিল। একবার পাপ বোঝার পানে চাহে, আর একবার দূরপথবর্ত্তী রঘুনাথের অস্পষ্ট মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে। যখন সে দেখিল, দাদামশায় রঘুনাথ চক্ষের অন্তরালে গিয়া পড়িতেছেন, তখন সে সত্যসত্যই পাপ বোঝার মায়া অনিচ্ছায় ত্যাগ করিয়া নিজ মতের বিরুদ্ধে উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে রঘুনাথের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপ যাইতে যাইতেও সে পাপবোঝার প্রতি যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি চলিয়াছিল, ততক্ষণ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া যাইতেছিল। তখন রাধানাথের শূন্য বক্ষের প্রাঙ্গণে বিসর্জ্জনের বিষাদ-বাদ্য বিষমভাবে বাজিতে ছিল। জগতে এমন কেহ নিষ্ঠুর নাই যে, তৎকালে রাধানাথকে দেখিয়া আহা বলিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা হইতে পানিহাটী (পেনেটি) গ্রাম সাড়ে চারিক্রোশ উত্তরে। এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বর্ণিত হইতেছে। ইহা পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পূর্ব্বতটস্থিত একটী উন্নত গণ্ডগ্রাম। তৎকালে ইহার শোভা-সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী একটী স্পৃহণীয় বস্তু ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ই, বি, এস্ রেলওয়ের সোদপুর ষ্টেশন হইতে পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর যাইলেই এই ইতিহাসকথিত পানিহাটী গ্রামটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই সময়ে পরম ভাগবত সর্ব্বগুণশালী শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাশয় ভক্তি-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অশেষ গৌরবশ্রী লইয়া এই পানিহাটী গণ্ডগ্রামখানিকে দীপালোকের ন্যায় সমুদ্ভাসিত করিতেছিলেন। এখনও ইহা শ্রীরাঘবপণ্ডিতের পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে এখানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে দণ্ডোৎসব হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু ভগবৎপরায়ণ ভক্ত পুরুষের সম্মিলন হয়। মহামতি পণ্ডিত রাঘব যদিও কৃতদার ও গৃহী ছিলেন, তথাপি তিনি নির্লিপ্ত যোগী পুরুষের ন্যায় নীরবগাম্ভীর্য্যে আপনার কর্ম্মজীবন কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রাখিতেন। নবদ্বীপে ভক্তিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মনে মনে তাহার সেবকরূপে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং অন্তঃসলিলা

ফল্গুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়দেশে ভক্তির স্রোত্ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে।

এক্ষণে সেই গণ্ডগ্রামটীর পূর্ব্বশ্রীসম্পদ কিছুই নাই। ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে তাহা দরিদ্র গৃহস্থকুলবধূর ন্যায় ম্লানমুখ ও অস্থিকঙ্কালসার হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজ লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বিলুপ্ত সম্পদের প্রাচীন স্মৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাগাইবার জন্য জীর্ণ অট্টালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকমালা লোকচক্ষে পতিত হয়।

সভক্ত নিত্যানন্দপ্রভু সমগ্র গৌড়কে ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিবার মানসে একমাস হইল পানিহাটীর ভক্ত শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরাঘবের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। সপরিবারে নিঃশেষিত-শ্রদ্ধায় অতিথিগণের সেবার জন্য প্রাণপণে সুব্যবস্থা করিতেছেন। নিত্যানন্দের আগমনে সকলেরই দিনরাত্রি কি পরমানন্দে যে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা কাহারও জ্ঞান ছিলনা। অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন। তাহার মধুস্রাবী উচ্চরোল অদূর গঙ্গা-সলিলে পবিত্র হইয়া সমীর-প্রবাহে সমুদায় গৌড়কে যেন ভক্তি-পুলককম্পনে কাঁপাইতেছিল। নিত্যানন্দদর্শনপ্রয়াসী সহস্র সহস্র ভক্ত তথায় আসিয়া কত জন্মজন্মান্তরের আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ যে লাভ করিতে ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সে যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি! সংযত সাধনার দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য! কোন্ ভাগ্যবান্ না তাহাকে কামনা করেন?

সে দিন প্রথমতঃ প্রভু নিত্যানন্দের সহিত মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব তিন সহোদরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন। ক্রমে দেখাদেখি গদাধর, রামদাস, পরমেশ্বর, পুরন্দর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। অমনি জয়ধ্বনির তরঙ্গ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আনিয়া অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিল। সে অতি অদ্ভুত দৃশ্য! ভাবের ভাবুক ও প্রেমের প্রেমিক না হইলে সে মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে না। সে ত আর পার্থিব ভোগ নয়, সে ভোগ সাধুর অন্তরের অন্তরতম রাজ্যের। সে ভোগের তৃপ্তির ত্রিধারা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া নিত্য অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে। সে ভোগে চিত্ত তুষ্ট ও স্খলিত হয় না; মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরের মত স্থির, ধীর ও নিশ্চল! বাহ্য বিপ্লবের কঠোর নিদারুণ আঘাতেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না! তাহার যাহা আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়বস্তু, সে তাহাতেই আত্মনিবেদন করিয়া জন্মমৃত্যুর বিভীষিকার বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে।

প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমের ভাবে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া গম্ভীর হুঙ্কারে নৃত্য করিতে ছিলেন! সে উদ্দাম নৃত্যের এমনি মাদকতা—এমনি আকর্ষণ—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ কেহই আর স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকেই তাঁহার সহিত যোগদান করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে স্বর্ণতারকাবলীখচিত নীলবসনের ন্যায় নির্ম্মল নীলাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া

যেন সেই নৃত্যে মিশিতে উদ্‌যোগ করিতে ছিল। পার্শ্বে শ্যামতরুশ্রেণীর পল্লবিত নতশাখাসকল সমীরসংস্পর্শে দুলিতে ছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল,তাহারাও যেন সংকীর্ত্তন-উচ্ছ্বাসে নৃত্যকারীদিগের সহিত নৃত্য করিতেছে। সেই নৃত্য এত মধুর যে, তাই পশ্চিমদিক্‌বাহিনী স্নিগ্ধচন্দ্রকরোজ্জ্বলা পূতসলিলা কলতরঙ্গা মা সুরধুনীও সংকীর্ত্তনের সুরে বিবিধ নৃত্যের চারুভঙ্গীতে বহিয়া যাইতে ছিলেন।
নিত্যানন্দের প্রেমভরা পদ্মচক্ষু যে দিকে যাহার চক্ষে মিলিত হইতে ছিল, সে অমনি প্রেমে ঢলিয়া পড়িতে ছিল। নিতাই যে তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়-সমুদ্রোত্তোলিত অমিয় প্রেমের পশরা মাথায় করিয়া গৌড়বাসীকে বিনামূল্যে বিলাইতে ছিলেন, তাই তাঁহার সেই অপরিমেয় দানের অমৃত পানে সকলেই অনাবিল প্রমোদে প্রমত্ত হইতে ছিল।

ক্রমে জনতার উপর জনতা হইতে লাগিল। সে জনতা-সমুদ্রের অন্য কোন তরঙ্গক্রীড়া নাই; কেবল সংকীর্ত্তনের উচ্ছ্বাসতরঙ্গ তালে তালে অনন্তের কানে কানে মহিমছন্দে যাইতে ছিল।

রঘুনাথ সেই প্রেমপ্লাবিত মুহূর্ত্তে পানিহাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাধানাথ এতক্ষণ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল. কিন্তু আর পশ্চাতে থাকিতে পারিল না। রঘুনাথ যে পথে নিত্যানন্দদর্শনে যাইতে ছিলেন, সেই পথে নিত্যানন্দদর্শনযাত্রী বহুসংখ্যক ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

ফেলিল। তিনি যেন সেই জনতাসমুদ্রের অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। সুতরাং রাধানাথ অতি সহজেই রঘুনাথ হারা হইল। সে রঘুনাথকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, কোথায় তাহার সেই লক্ষ্যীভূত দাদামশায়! যাহার জন্য সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের সহিত বহুতর্ক ও সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াও পরাজিত ও লাঞ্ছিতভাবে প্রভুপ্রদত্ত মূল্যবান্ দ্রব্যসকল পাপের বোঝা বলিয়া পথিমধ্যে পরিহার করিয়াছিল, হায় কোন্ দৈব মুহূর্ত্তে দানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সেই বাঞ্ছিত নিধি দাদামশায়কে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিল! ক্রমে লোকের উপর লোক আসিয়া রাধানাথকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। সে আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। তাহার নিরুদ্ধ রোষ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সেই বিদ্রোহী জনসঙ্ঘের প্রতি ঘুষা-কিল-লাথিতে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেই রুদ্রমূর্ত্তির নিকট তখন কেহ আর থাকিতে সাহসী হইল না। প্রাণভয়ে সকলেই দূরে পলাইতে লাগিল।

তখনও সশিষ্য নিত্যানন্দের অদ্ভুত নৃত্য পূর্ব্ববৎ চলিতে ছিল। এ হলহলা তাঁহাদের কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। সমাগত ভক্তজনেরও তন্ময়তা ভঙ্গ হইল না।

রাধানাথ এত করিয়াও যখন রঘুনাথকে দেখিতে পাইল না, তখন সিংহগর্জ্জনে "দাদামশায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাও সার্থক হইল না বুঝিয়া সে হতাশপ্রাণে নিরাশ-

হৃদয়ে ও দারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। একে সমস্ত দিন উপবাস, তাহাতে পথশ্রম,—আবার তাহার উপর এই সংঘর্ষ! ক্লান্ত রাধানাথ বিমূঢ়ভাবে বৃক্ষতলে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাই ধারণা করিল, এ নিতাইঠাকুর সহজ লোক নহে. যাকে দেখ্‌তে গেলে প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হয়; বোঁচ্‌কাবুচ্‌কি ত অতি তুচ্ছ!



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ যে শ্রান্ত হইয়া ছিলেন না এমন নহে। তবে তিনি ভাবের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে নবশক্তি লাভ করিয়া সেই শর্করা-বেষ্টিত পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় বিপুল জনসঙ্ঘ সহজেই অতিক্রমে সমর্থ হইলেন। তখন নৃত্যশেষে তন্ময় হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু বহুকীর্ত্তনীয়া ও সেবক ভক্তগণ-সহিত গঙ্গাপুলিনস্থ একটী বৃক্ষ-মূলে এক সুসজ্জিত রম্য পুষ্পসম্ভারপূর্ণ বেদির উপর কোটী চন্দ্রের আভায় বসিয়াছিলেন। সুন্দর ফুলসৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার অনুপমরূপ সৌন্দর্য্য এক অপরূপ সুষমা বিস্তার করিতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেবোপম জ্যোতির্ম্ময় চারু অঙ্গ ভাবাবেশে মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতে ছিল। ভক্তসকল নম্র ও সন্তোষদীপ্তমুখে তাঁহার চারিপার্শ্বে মণ্ডলাকারে থাকিয়া পুষ্প ও ধূপধুনার গন্ধদানে সেবা করিতে ছিল। তাহার মদির গন্ধে সেই স্থানসকল আমোদিত হইতে ছিল।

রঘুনাথ দূর হইতে সেই নির্ম্মল ভাবময় পুরুষটী দেখিলেন। দেখিয়াই ভাবাবেশে তাঁহার চলচ্ছক্তি হীন হইল। চক্ষের পাতা ফেলিতে পারিলেন না। পলক আর পড়িল না। তিনি এক স্বপ্নরাজ্যে গিয়া একটা অব্যক্ত স্বভাবসৌন্দর্য্যের চিত্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। আহা মরি মরি, সে সৌন্দর্য্যের নীরবমহিমা যেন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রেমানন্দে অধীর হইয়া রঘুনাথ অমনি প্রাঙ্গণধূলির উপর অষ্টাঙ্গ প্রণত করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। চক্ষে অবিশ্রাম জলধারা গিরিনির্ঝরের মত ঝরিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবেগপূর্ণ আর্ত্তস্বরে কহিলেন, আমি অতি নরাধম, আমাকে শ্রীপদে আশ্রয় দিন্।

পরম ভাগবত শ্রীরাঘবাচার্য্য রঘুনাথকে চিনিতেন, তিনি রঘুনাথের অন্তরের লীলায়িত প্রেমাবেগ দেখিয়া কাতরভাবে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন, প্রভু, আপনার কৃপাপ্রার্থী ভক্ত শ্রীরঘুনাথ আপনাকে প্রাণের নৈবেদ্য দানে প্রণাম করিতেছে।

ভক্তবৎসল প্রেমোচ্ছ্বলিত পদ্মচক্ষু নিত্যানন্দ গভীর প্রেমাবেশে রঘুনাথের পানে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার পুলকে তাঁহার প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল। অমনি তিনি বাহু প্রসারণপূর্ব্বক বেদি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া "চোরা এসেছিস, আয় আয়, আজ তোকে সমুচিত দণ্ড দোব" বলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুনাথও করুণাময়ের প্রেমাহ্বানে কৃতার্থন্মন্য হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন বটে, কিন্তু

তাঁহার পুরোভাগে আর অগ্রসর হইলেন না। ধূলার উপর নতজানু ও কৃতাঞ্জলিপুটে আবার পূর্ব্ববৎ নির্নিমেষনেত্রে সেই স্থিরমূর্ত্তি সবিতার ন্যায় রূপরশ্মিমণ্ডলবর্ত্তী প্রেমময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি? সে দেখার কি তৃপ্তি আছে? যে দেখার তৃপ্তিধারা জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিলেও আবার পানের আশা আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসে, যে দেখার তৃপ্তি সুন্দরী পৃথিবীর ষড়ঋতুর নব নব সৌন্দর্য্যেও দুষ্প্রাপ্য, জগতের কোন নট-নটী যাহা তাহাদের মনোহর অভিনয়েও প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না, সে তৃপ্তি-মহাকাশের সীমা কোথায়? বিরাট বসুধার কোন স্তরে কি তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে? তাহা যে অসীম—অনন্ত—বাহ্যদৃষ্টির বহির্ভূত। নিত্যানন্দ প্রভু যত আনন্দে রঘুনাথের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, রঘুনাথও তত সঙ্কোচে—"আপনাকে প্রভুর অস্পৃশ্য ও অতিহীন বিবেচনায়" দূরে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবগ্রাহী সুরসিক ঠাকুর নিত্যানন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনর্ব্বার "চোরা আয় আয়, আজ তোকে সমুচিত দণ্ড দিব" সম্বোধনে দ্রুতপদে যাইয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আপনার শ্রীপদ তাঁহার মস্তকে তুলিয়া দিলেন।

রঘুনাথ অমনি জন্মজন্মান্তরের পরমসৌভাগ্য স্মরণে কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, প্রভু, আমি অতি নরাধম, আমায় কি দণ্ড দিবেন দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন শ্রীচৈতন্যশ্রীপদসঙ্গ লাভে সমর্থ হই।



রঘুনাথের নিত্যানন্দ-সম্মিলন।

অমনি চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণের মুখনিঃসৃত হরিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ প্রভু সম্মিলিত ভক্ত ও সেবকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে দেখ, দেখ, তোমরা ইহাকে চিন কি? এই ব্যক্তি এক ধনকুবেরের একমাত্র পুত্র। রাজৈশ্বর্য্যের অপেক্ষা ইহার ঐশ্বর্য্য কোনরূপে ন্যূন বা হীন নহে! আবার রাজার মত ইহার অতুল প্রভাব! গৃহে প্রেমময়ী পূর্ণ-যৌবনা ভার্য্যা; স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা উভয়ই বর্ত্তমান। যাহা লাভের নিমিত্ত লোকে উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় রসা-তলের নিবিড় অন্ধকারকেও প্রিয় ভাবে এবং কোনরূপ দুষ্কার্য্য কর্‌তে পশ্চাৎপদ হয় না, এই ব্যক্তি সেই সম্পদশ্রীর শতদলপদ্ম স্বেচ্ছায় পদদলিত করে নিত্য নির্ম্মল আনন্দময় শ্রীচৈতন্যধন প্রাপ্তির কামনায় কাঙালের সাজে আমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর্‌ছে।

অমনি চতুর্দ্দিক হইতে আবার ভক্তমুখনিঃসৃত মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি হইতে লাগিল।

তখন নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, রঘুনাথ, তাই হবে। তোমার প্রার্থিত বস্তু তুমি লাভ কর্‌বে! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাক্‌বে না!

রঘুনাথ কৃতার্থ হইলেন! আবার হরিধ্বনি হইতে লাগিল। রাধানাথ তখনও মায়ামন্ত্রজালে বদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রভুদত্ত বোঁচকাবুঁচকির বিষয় ভাবিতে ছিল এবং তাহার শূন্য হৃদয়ের মধ্যে দাদামশায়ের বিরহজনিত একটা বিশেষ দুশ্চিন্তার "হা হা"

আর্ত্তনাদ শুনিতে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই নির্ব্বিকার ক্ষেত্রে আসিয়াও তাহার একবার শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হইল না।

কিয়ৎক্ষণের পরে রঘুনাথ প্রভুর নিকট দণ্ডপ্রার্থী হইলেন, তিনিও রঘুনাথের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন! সে দণ্ডটা কি? "তুমি আমাদিগকে এই গঙ্গাপুলিনে প্রচুর দধি-চিঁড়া-মিষ্টান্ন আনাইয়া ভোজন করাইয়া দাও।"

প্রভুর এই অপার অনুগ্রহ-দণ্ড রঘুনাথ পরমানন্দে নত মস্তকে স্বীকার করিলেন এবং তাহারই সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি তাঁহার রাধানাথ দাদাকে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় রাধানাথ? এতক্ষণ যে তাহার কথা তাঁহার আদৌ স্মরণ ছিল না; কার্য্যকালেই হঠাৎ মনে হইল। মনে ত হইল, কিন্তু কোথায় সে! রঘুনাথ একটু চঞ্চল হইলেন এবং প্রভুর আদেশ লইয়া তৎক্ষণাৎ রাধানাথের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন! সঙ্গে শ্রীরাঘব পণ্ডিতও চলিলেন, কেন না রঘুনাথ আজ তাঁহার গৃহের অতিথি!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দর জ্যোৎস্নালোক! পল্লীর নিবিড় শ্যামল তরুরাজির পাতায় পাতায় সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকর ছড়াইয়া পড়িয়া নীল

মখ্‌মলের উপর শুভ্র রজতের শিল্পকার্য্যের ন্যায় দেখাইতে ছিল। চিরপূতা জ্যোৎস্নামণ্ডিতা গঙ্গোর্ম্মিমালা যেন সুন্দরী রমণী-বক্ষে কারুখচিত চারু হারের মত শোভা পাইতেছিল। গলিত-রজতপ্লাবনে মুক্ত পথ-ঘাট-প্রাঙ্গণ ডুবিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রভুর কীর্ত্তন ও নর্ত্তন বন্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আবার সেই বাহ্যসম্বিদ্‌হারা ভুবনজয়ী প্রেমসুধামগ্ন সনৃত্য হরিনাম-সংকীর্ত্তন আরব্ধ হইবে। তাই শ্রোতা ও দর্শক-বৃন্দ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া সেই মুহূর্ত্তের মুখ চাহিতে ছিল। যে মধু-প্রয়াসী ভ্রমর একবার মধুর মিষ্ট আস্বাদ পাইয়াছে, সে কি কখন মধুময় পুষ্পসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে? তাহার যেমন লক্ষ্যীভূত একমাত্র পুষ্প, সেইরূপ সমাগত ভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য সংকীর্ত্তনের আরব্ধকাল।

রঘুনাথ রাধানাথের সন্ধানে সেই জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গা-তীরস্থ উন্মুক্ত পথ-ঘাট ও প্রাঙ্গণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু রাধানাথকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

বহুদুশ্চিন্তায় অবসন্ন পথশ্রান্ত রাধানাথ তখনও পূর্ব্বকথিত বৃক্ষতলে তন্দ্রাভিভূত ছিল। বৃক্ষটী নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত থাকায় তথায় স্ফুটচন্দ্রালোক প্রবেশ করিতে ছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে রঘুনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই চিনিলেন, তাঁহার রাধানাথ দাদা বৃক্ষতলে শায়িত ও নিদ্রালু। তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে "রাধানাথ দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সে সম্বোধনে রাধানাথ শশব্যস্তে উঠিয়া চক্ষু [illegible] করিতে

করিতে বলিল, আঃ—দাদামশয়, রক্ষে হ'ল! ভাবনায় আমার সমস্ত হাত পা গুটিয়ে গেছ্‌লো।

পুনঃ চক্ষু চাহিয়া বলিল, আঃ—এখনও যে লোকের ভিড়!

সান্ধ্যকীর্ত্তন শুনিতে তখনও পালে পালে লোক জমিতে ছিল।

রঘুনাথ কহিলেন, ভিড় হবেনা? মানব-ভাগ্যে এমন দিন ক'বার ঘট্‌বে! তুমি ঠাকুর দর্শনে যাওনি?

"উঃ—যে লোকের ভিড়, ভিতরে সেঁদোয় কার বাপের সাধ্যি! আমার অদৃষ্টে তা ঘট্‌বে না দাদামশায়! লোকের সঙ্গে খুনোখুনি না কর্‌লে ত আর আপনার ঠাকুর দর্শন হবেনা! তা—রাধানাথের শক্তিতে আর কুলোবে না। বলে নিজে বাঁচ্‌লে ত বাপের নাম। সারাদিনটা নাওয়া খাওয়া নেই, তার উপরে ডালভাঙা ক্রোশ হাঁটা, বড় কাবু হ'য়ে গেছি দাদামশায়! ঠাকুর দর্শন আজ থাক্, কাল যা হয়, কর্‌ব। এখন একটা বাসাটাসার যোগাড় দেখিগে চলুন। আপনারও ত মুখ শুকিয়ে গেছে।

রঘুনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, এখানে আর বাসা মিল্‌বে কোথায় ভাই—

অমনি শ্রীরাঘব ঔৎসুক্যসহকারে রাধানাথকে বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, না, না, বাসা পাবে বৈকি! তুমি ওঠ বাবা! আমার কুটিরে অতিথিনারায়ণ তোমরা এসেছ, তখন চিন্তা কি? গৃহে স্থান সংকুলান না হলেও আমার শ্রদ্ধার স্থানের অনাটন হবে না। চল বাবা, আগে কিছু খাবে চল।

ভক্তির নম্র বাণীতে রাধানাথ যেন কেমন হইয়া গেল। সে প্রাণের আবেগে জড়িত কণ্ঠে তাহার দাদামশায়কে কহিল, হাঁ—দা-দা-মশায়-এই-কি—আপ-নার নিতাই—ঠাকুর !!

শ্রীরাঘব শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার সর্ব্বগাত্র কণ্টকিত হইল। তিনি তৃণের অপেক্ষা লঘু হইয়া বলিলেন, না বাবা, অধম তাঁর দাসানুদাসেরও যোগ্য নয়। সেই হৃদয়ের সত্য-পুরুষটী কি এখানকার? কেবল আমাদের মত পাতকী উদ্ধার করতে তিনি স্বর্গ হ'তে নেমেছেন। আমার নাম রাঘব পণ্ডিত। এখন চল, আহারাদি কর্‌বে। তুমি বড় কাতর হ'য়ে পড়েছ।

রাধানাথ দেখিল, শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাশয় সত্য সত্যই এক দেবতাস্বরূপ, নতুবা এত নম্রতা, এত করুণা মানুষের কি থাকিতে পারে? তখন সে ক্ষুধার সাংঘাতিক তাড়নায় রঘুনাথের আজ্ঞা-প্রার্থনায় তাঁহার মুখের পানে চাহিতে ছিল। কিন্তু রাক্ষসী ক্ষুধা বুঝি রাধানাথকে আর রঘুনাথের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে দিল না। রাক্ষসী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিল। রাধানাথ গাত্রোত্থান করিল। রঘুনাথ রাধানাথের কাতর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্চি, তোমাকে কল্য প্রাতেই চাঁদপুরে যেতে হবে।

অমৃতপথ-যাত্রী রঘুনাথ এই বলিয়া জ্যোৎস্নামণ্ডিত আলোকে গঙ্গা-পুলিনাভিমুখে সেই অমৃত-উৎসের পানে যাত্রা করিলেন। তখন নিত্যানন্দের হরি-সংকীর্ত্তনের খোল করতালের মধুর শব্দ গম্ভীর নিনাদে ধ্বনিত হইতে ছিল। শ্রীরাঘবও ব্যস্ত হইয়া

রাধানাথকে "চল বাবা, শীঘ্র চল" বলিয়া নিজ বাটির অভিমুখে অগ্রেসর হইলেন। রাধানাথ নির্ব্বাক্ মুখে তাহার দেবতাস্বরূপ করুণার সাগর পণ্ডিত মহাশয়ের পদানুসরণ করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাধানাথের আর ঠাকুর দর্শন ঘটিল না। পরদিন অতি প্রত্যূষেই সে রঘুনাথের পত্র লইয়া চাঁদপুরে যাত্রা করিল। যথাসময়ে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন রঘুনাথের সবিনয় লিপি পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং তাহার পরদিনেই কয়েকটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহিত রঘুনাথের প্রার্থিত মুদ্রা দিয়া পানিহাটিতে পাঠাইলেন। রাধানাথ আর সঙ্গে গেল না। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই যাইল না। যেখানে রঘুনাথের উপেক্ষিত পাপের বোঁচকা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ক্ষুব্ধপ্রাণে বর্জ্জন করিয়াছিল, সেখানে রাধানাথ পানিহাটি হইতে ফিরিবার কালে তাহা পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় বহু অন্বেষণ করে, কিন্তু রাধানাথের অতি দুঃখের কারণ হইল যে, সে তাহার বাঞ্ছিত দ্রব্য—চাঁদপুরের দাসমহাশয়দের দ্রব্য পাইল না। তাহার এইরূপ অনুসন্ধানেরও প্রধান কারণ ছিল। যখন রঘুনাথ "বোঁচকা ত্যাগ না করিলে আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হইবে না" বলিয়া রাধানাথকে ত্যাগোদ্যত হন, তখন রাধানাথ মনে মনে শেষ এই

সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া ছিল, "এখানে বোঁচকা রাখিয়া গেলুমই বা! চাঁদপুরের দাসমহাশয়দের জিনিষে হাত দেয় এমন ঘাড় কার?" কিন্তু আবার যখন সে প্রত্যাগমনকালে তাহার সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখিতে পাইল, তখন রাধানাথ বাস্তবিকই একটা বুকভাঙা হা হুতাশময় সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া ছিল। এই তাহার পানিহাটি না যাইবার প্রধান ও প্রথম কারণ।

তাহার উপর "দাদামশায়ের ঠাকুর দর্শনে খুনোখুনি করিতে হয়, এমন জায়গায় মানুষে যায়?" ইহা দ্বিতীয় কারণ। এতদ্ব্যতীত আরও সাংসারিক নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণসমষ্টি তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের সহিত জড়িত ছিল। যে কারণেই রাধানাথ পানিহাটি না যাউক, কিন্তু সে শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে তখনও ভুলিতে পারে নাই। রাধানাথ কর্ম্মের অবসানে তাহার মায়া-মোহঘূর্ণিত হৃদয়খানিতে সেই দেবপুরুষের নিখুঁত করুণার শান্তমূর্ত্তিটা দেখিত। দেখিয়াই তাহার মনে প্রশ্ন জাগিত, এই মানুষ ত আমি, আর সেই মানুষ ত তিনি, তবে তাহাতে আমাতে এত তফাৎ কেন? মূর্খ মায়ান্ধ রাধানাথ সাধুসঙ্গগুণের মহিমা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তবে সে সেখান হইতে আসা অবধি এই মায়াপঙ্কিল পৃথিবীটাকে যেন নূতন ও ঘোর আবর্ত্তময় দেখিতে লাগিল। কর্ম্মমুক্ত হইলেই সংসার-অনিত্যতার চিত্রগুলি তাহার নয়নপথের পথিক হইত, অমনি সে সমস্ত জড়দেহের সহিত একাগ্র সংযত মনে কত কি ভাবিত। যে রাধানাথ নিজের খাওয়া পরা, আর দাসমশায়দের আজ্ঞা তামিল

কর্‌্যা বই এ দুনিয়ায় অপর কিছুই জানিত না, তাহার এমনটা কেন হইল? সংসারটা যদি কিছুই নয়, তবে মানুষ আপনা আপনি খাওয়াখায়ি ক'রে মরে কেন? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সে অমনি ম্রিয়মাণ হইত; কখন বা বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিত। ক্রমে রাধানাথের হাসি-কৌতুক-আমোদ-প্রমোদ সকলই যেন জন্মের মত বিদায় লইতে লাগিল। জাগরণে তাহার ত এই দশা ঘটিল, আবার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিত, ওগো মানুষ জনম জনমিয়া কি করিলাম! ক্রমে রাধানাথের শারীরিক বৃত্তিসকল নিস্তেজ হইতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল। সেই বলদৃপ্ত বীরমূর্ত্তি, দুর্ব্বল নিষ্প্রভ শীর্ণ হইল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, রাধানাথ রোগগ্রস্ত হইয়াছে! কিন্তু কি রোগ? রোগ যাহাই হউক, রোগ ত বটে! চিকিৎসা ত চাই। কিন্তু সে চিকিৎসা কি? তাহার ঔষধই বা কি?

* * * *

এদিকে গোবর্দ্ধন-প্রেরিত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণ মুদ্রাসহ যথা সময়ে চাঁদপুর হইতে পানিহাটিতে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথও নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ মত অনুগৃহীতভাবে দধি-চিড়া ও প্রচুর মিষ্টান্ন আনাইয়া যথা দিনে গঙ্গাপুলিনে মহা-সমারোহে ভক্ত-ভোজন মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই পুলিন-ভোজন-মহোৎসব-মহাব্যাপারে রঘুনাথ প্রভুর আদেশ লইয়া ভক্তগণকে মুক্তহস্তে অগণিত ধনরাশি বিতরণে

কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কৃতার্থ রঘুনাথ পরিশেষে সভক্ত প্রভুর পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রসন্ন প্রাণে যথা সময়ে স্বগৃহে আসিলেন; কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। স্বেচ্ছায় দুর্গামণ্ডপেই তাঁহার অবস্থিতির স্থান স্থির করিয়া লইলেন। এক্ষণে রঘুনাথের প্রতি প্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুরের এইরূপ দণ্ডবিধি-দান কেন হইল, ইহা একটী বিশেষ ভাবিবার বিষয়! মনে হয়, চৈতন্যপ্রয়াসী রঘুনাথের ধনাসক্তি ও অনাসক্তি পরীক্ষার জন্যই প্রভুর এই দণ্ডবিধির উদ্ভাবনা। রঘুনাথ সেই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নিত্যানন্দের আন্তরিক প্রেমপূর্ণ আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হন এবং সেই আশীর্বাদই তাঁহাকে পরিণামে সংসার-কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়া ছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবযৌবনাঙ্কুরে যেমন নরনারীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি রূপান্তরিত ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিশেষ বিকশিত হয়, সেইরূপ নিত্যানন্দ সাক্ষাতের পর হইতেই রঘুনাথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়াদি একনিষ্ঠ ভাবে জাগিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মাতা বিজয়া ও পিতা গোবর্দ্ধন বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িলেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব লইয়া অনেক কল্পনা-জল্পনাও করিলেন; কিরূপে এবং কি উপায়ে

রঘুনাথকে গৃহবাসী করা যায়। অনেকেরই মত হইল, রঘুনাথ যাহাতে হঠাৎ গৃহত্যাগী হইতে না পারে, তজ্জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করা হউক, তাহাই হইল। নীরব নির্লিপ্ত যোগী সেই প্রহরীবেষ্টিত সাধারণের অনধিগম্য দুর্গা-মণ্ডপে আপনার অন্তরতম প্রেমদেবতাটীকে নীরবে সেবা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু কৈ প্রেমিক ভক্তের চিত্ত-স্রোতের একমুখী গতি ত কুশাঙ্কুরের আঘাতের ন্যায় সামান্য বাধাও প্রাপ্ত হইল না।

দিন দিন যদিও শরীর কৃশ হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অমলচন্দ্রকান্তি দেব-মাধুর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইল। মুখশ্রীতে কি যেন চির সুন্দরতা চির মঙ্গলের অমৃতোৎস খেলিতে লাগিল। সে মূর্ত্তি বিশ্ব-বেদনার সঙ্গহীন বহু ঊর্দ্ধাসনের বিশ্ব-মানবের পূজার বস্তু। তাঁহাদের অন্তরের আরব্ধ সাধনার চরম ধন। যে প্রেম আত্ম-প্রতিষ্ঠ, আর যে ভাগ্যবান্ সেই নিত্য-নব বৈচিত্র্যময় প্রেমের প্রেমিক, তাঁহার আবার দুঃখ-ভাবনা কি? তাঁহার জয়টীকা বিশ্বনাথের মঙ্গলকর-প্রদত্ত। তাঁহার পরাজয় বিশ্বরাজ্যে কি আছে? বিজিতও যে তাঁহার পদে মস্তক লুণ্ঠন করে! আনন্দের দ্বারেও তাঁহাকে কখন রিক্ত অঞ্জলি লইয়া প্রার্থনা করিতে হয় না। তিনিও পূর্ণ, তিনিও নিত্য আনন্দশীল!

এখন মঙ্গলময়ী রেবতীর কথা—রেবতী রঘুনাথের নিত্যানন্দ-

দর্শন-যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহার প্রিয় স্বামীকে বলিয়া ছিল, যদি তোমায় একান্তই সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে দিনকতক অপেক্ষা করিয়া যাও,—আমি আপনাকে গড়িয়া তুলি। তবু সে বলে নাই যে, না, তাহা হইবে না, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পাইবে না। সে আপনাকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে ছিন্নমস্তার ন্যায় বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহার দুর্ব্বল ক্ষত মনকে শক্তিমান্ করিতে এক অজ্ঞাত নূতন গন্ধমাদন পর্ব্বতের বিশল্যকরণীর অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহারও এক নীরব সাধনা। রুদ্ধ তপ্ত অশ্রু যদিও সে সাধনার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তথাপি সিদ্ধিপ্রার্থিনী সাধিকার মহাযোগের সর্ব্ববিজয়িনী শক্তির নিকট সে সম্পূর্ণ পরাজিত। রেবতীর সেই প্রশান্ত-সাগর সদৃশ স্থির ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কে, না বলিবে,—জগন্মাতা মহাশক্তি মহাদেবী সেই গৈরিক বসনা নব-যোগিনীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রস্ফুটিতা নহেন? আমরি মরি—সিদ্ধা সন্ন্যাসিনীর কি রূপ-সৌন্দর্য্য! প্রতিলোমকূপ হইতে যেন অংশুমালীর সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। তাহাও অতীব বিস্ময়কর! সে কিরণ প্রখরতাশূন্য—উজ্জ্বলতায় সূর্য্য-রশ্মি আবার কোমলতায় স্নিগ্ধ চন্দ্রমা। সলজ্জ অথচ সঙ্কোচ-হীন! প্রেমোন্মাদিনী অথচ বিরহিণী নায়িকা নহে। আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনারা কি সেই রূপ-মধুরা মূর্ত্তি কখন দেখিয়াছেন? যদি না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক-

য়ার নিরুদ্ধচিত্তে ধ্যানের আসনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে মূর্ত্তির ধ্যান করুন।

আমরি মরি! কি চারু রূপচ্ছটা! দেখুন—দেখুন রঘুনাথের প্রেমময়ী রেবতীর রূপমাধুর্য্য! হৃদয়ের স্তরে স্তরে সে রূপের ঢেউ সানন্দে নাচিয়া যাইবে! প্রতিনিশ্বাস-বায়ু-হিল্লোলে সে রূপ-রেণু খেলিয়া বেড়াইবে! সমগ্র বিশ্ব যেন সে রূপের রসে ডুবিয়া রহিয়াছে, দেখিবে। এ মধুর রূপের তুলনা হয় কি? দেখুন—দেখুন, কামনাহীন প্রাণে রূপের নীরব মূর্ত্তির ধ্যানই প্রেমিকের সাধনার উচ্চ স্তর! দেখিবেন—চাঞ্চল্যে যেন সে যোগ ভঙ্গ করিবেন না! যোগই যোগি-যোগিনীর জীবন! যোগ ভঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তখন মানুষ আমরা, আমরা ত কোন্ ছার! দেখিতেছেন—মা রেবতীর কি রূপ! এ রূপ বিরাট্ বিশ্বের যাবতীয় রূপ লইয়া গঠিত! এ রূপ অচঞ্চল স্থির চিরকুমার! চতুর্যুগে কেহ কখন ইঁহার বার্দ্ধক্য দেখিতে পান নাই। এ রূপ নায়কের আয়ু-বর্দ্ধন করে, সন্তানকে অযুত-সিংহশক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া তুলে, সম্বন্ধ-রহিত ব্যক্তির সহিত নিকট সম্পর্ক আনিয়া দেয়।

রূপ এ জগতে কে না চায়? এমন কি পথমধ্যে একখানি চিত্রপট দেখিলেও লোকে তাহা দেখিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু সে রূপ একরূপ—পার্থিব রূপ! আর এরূপ মহামায়া মহাশক্তির অপার্থিব রূপ! এই রূপের মূর্ত্তিতেই দাঁড়াইয়া পতিপ্রাণা সতী দক্ষযজ্ঞে আত্মাহুতি দান করেন! এই

রূপের মূর্ত্তিতেই পতিব্রতা সাধ্বী সাবিত্রীদেবী যমপুরী হইতে মৃত-পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপের মূর্ত্তিতেই পতিপ্রাণা একান্তমতি সতী লক্ষ্মী দময়ন্তী গ্রহপীড়িতাবস্থাতেও নিবিড় অরণ্যে থাকিয়া কামান্ধ ব্যাধকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হন। এই রূপের মূর্ত্তিতেই পতিপ্রাণা রাম হৃদয়েশ্বরী মা জানকী বলদর্পিত সুরনরযক্ষত্রাস দশাস্য রাবণের শৈলোন্নত মহাগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ছিলেন। এই রূপের মহাশক্তিতেই শত শত রাজপুত-ললনা অক্ষুণ্ণ প্রাণে পতিপুত্রকে মনের মত বীর-সজ্জায় সাজাইয়া ভীষণ নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে চিরজন্মের জন্য বরণ করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। রেবতী আজ সেই রূপে রূপবতী। তাই সে আজ অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিময়ী নিষ্কামদেবীর জ্যোতিষ্মতী প্রতিমূর্ত্তি। ওমা ত্যাগময়ি স্বামিমঙ্গলে! আজ কি রূপ দেখাইলে মা!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ দুর্গা-মণ্ডপেই থাকেন, অন্তঃপুরে আদৌ প্রবেশ করেন না। প্রেমময়ী সাধ্বীর তাহাতে কোন উৎকণ্ঠা নাই। কেন থাকিবে? সে যে মনকে গড়িয়া তুলিতে ছিল। যদি মন চঞ্চল হইত, অমনি মনের সহিত তাহার ঘোর তর্কবিতর্ক চলিত। একদিন তাহাদের তাহাই হইতে ছিল। মন কহিল,

কেমন পাষাণী তুই গা! একবার স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা হয় না?

রেবতী কহিল, স্ত্রীলোকের আবার স্বাতন্ত্র্য কি মন! আমার ইচ্ছায় কি হইবে? তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক!

মন কহিল, কেন আপন নারীত্ব তুই বিস্মৃত হইতেছিস্? স্ত্রীলোকের স্বামীই ত সর্ব্বস্ব!

রেবতী কহিল, ইহাতে আমার নারীত্ব কিসে যাইতেছে? তখনও তিনি আমার সর্ব্বস্ব ছিলেন, এখনও ত তাই আছেন।

এবার মন ঈষৎ ব্যঙ্গ-সহকারে কহিল, তাই সর্ব্বস্ব বাহিরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছিস্? সর্ব্বস্ব বলিয়াই কি এত আদর গা?

তখন রেবতী ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তগণ্ডে সিংহগর্জ্জনে কহিল, স্থির হ নীচ! তোর ন্যায় আমি অন্তঃসার-হীনা নই। আমার প্রাণ আছে। আমি বুঝি আমার স্বার্থ। তুই কি বুঝ্‌বি? নারীত্ব কি স্বাতন্ত্র্যে রক্ষা পায়? নারীর শক্তি পুরুষের কৃপা।

তখন মনও একটু অসন্তুষ্টভাবে কহিল, আর বুঝি পুরুষের শক্তি নারীর কৃপায় নয় রেবতি! তুই নিজে এত খাটো হ'তে চাস্ কেন? প্রাণ সকলেরই সমান। আত্ম-মর্য্যাদা সকলেই চায়। স্বার্থপর পুরুষ নিজের গণ্ডা ষোল আনারও উপরে চাপিয়ে নারীজাতিকে এত দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছে। তা তুই একা নোস্, বিশ্বের সমগ্র নারীজাতিরই আজ এই দুর্ব্বলতা!

রেবতী আর রোষ সম্বরণ করিতে পারিল না, তাই সে

বাঘিনী-দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষ-কণ্ঠে বলিল, মন! তুই নিজে দুর্ব্বল। তাই বিশ্বের নারীকে দুর্ব্বল দেখ্‌ছিস্? মন! নারী দুর্ব্বলা নয়, নারী স্বার্থ-ত্যাগিনী এই স্বার্থহীনতার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বের সমগ্র মহিলামণ্ডলীকে নিঃস্বার্থ প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি ক'রে নির্ম্মাণ ক'রেছেন। তজ্জন্যই নারীর গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি। বল দেখি মন! নারী স্বার্থত্যাগিনী না হ'লে কি বুকের রক্ত দিয়ে প্রাণপাতে সন্তান পালন ক'র্‌তে সমর্থ হ'ত? স্বার্থত্যাগেই নারীর গৌরব; তাতেই নারীত্ব। ভোগ-সুখ লালসা নারীত্বের নিদর্শন নয়; ত্যাগই নারীত্বের বিজয়-স্তম্ভ ও নারীজাতির সার্থকতা। নারীর কৃপায় পুরুষের শক্তি নয় মন, পুরুষের শক্তিই নারী। যদিও নির্গুণকে আমরা সগুণ করি, কিন্তু পুরুষের তাতে গৌরব কি। লতিকা চিরদিনই তরুর অন্বেষণ করে—তার আত্ম-রক্ষার জন্য।

মন আবার কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল, রেবতী তাহাকে আর কোন কথা কহিতে দিল না! সে নিজে অপরাধিনী ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার সর্ব্বস্বের পাদপদ্ম একান্ত প্রাণে চিন্তা করিতে লাগিল। তখন রেবতী তন্ময়ী। যেমন গিরি-নিঃসৃত প্রবল বন্যায় নদনদীর দুই কূল হঠাৎ ভরিয়া উঠে, সেইরূপ স্বামী রঘুনাথের শান্ত সৌম্য অমৃতময় রূপে তাহার সমগ্র হৃদয় পূর্ণ হইল। সে সেই প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গেল। রেবতী পূর্ব্বে একটী রঘুনাথ-মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিত, এখন ধ্যানে শত শত রঘুনাথ মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিপথ উজ্জ্বল করিয়া নিশ্চলভাবে

দণ্ডায়মান রহিল। মরি মরি সতীর পতিভক্তি কি মধুস্রাবশীল! কি মলয়স্পন্দন-সুখকর?

এমন সময় রাঙা দিদিমা রেবতীর পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া নম্র কণ্ঠে কহিলেন, অন্নপূর্ণে কি ভাব্‌ছিস বোন্!

বাহ্যজ্ঞানহারা রেবতী তখনও দিদিমার আগমন-বার্ত্তা জানিল না! দিদিমা আবার একটু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, ও অন্নপূর্ণে! কি ভাব্‌ছিস্ দিদি! তুই যে একেবারে কেমন হয়ে গেলি! ওঠ্ না, নাবি-খাবি কখন? বেলা কি আর আছে! সূর্য্যিঠাকুর যে পাটে বস্‌তে যায়!

রেবতীর অবস্থা তখনও তাই! দিদিমা রেবতীর গাত্র স্পর্শ করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিলে সে শিহরিয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, দিদিমা! আপনি কখন এলেন?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে তখন পতিততারণ দয়াল ঠাকুর প্রভু চৈতন্যদেব সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বভূতে ভক্তির অমিয়ধারা বিতরণের জন্য নীলাচলে অবস্থিত। তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য গৌড়ের যাবতীয় গৌরভক্ত মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত নীলাচলের পথে ছুটিতেছিলেন। রঘুনাথ তাহা শুনিয়া আরও আকুল হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের সমুদায় তারগুলি বীণাযন্ত্রের ন্যায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

তীব্র আকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে আকুলতা মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ বোধ করে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাইবার উপায় কি? সতর্ক প্রহরীগণ অহোরাত্র তাঁহাকে প্রহরা দিতে ছিল। সুতরাং তাঁহার আত্মার সমুজ্জ্বল দৃষ্টি ফল্গু-গঙ্গার ন্যায় অন্তরেই বহিতে থাকিল, কিছুতেই বহুবিধ অজেয় বিঘ্ন-বিপত্তির করাল কর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। হতাশপ্রাণে দর দর অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে দীনহীনের ন্যায় দাস্যভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রির এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট! আত্ম-বিস্মৃত দুঃখী রঘুনাথ সেই দুর্গামণ্ডপের একটী প্রকোষ্ঠে চোখের জলে ভাসিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, হায়! হায়! ভাগ্যে বুঝি আর প্রভুদর্শন ঘটিল না। বৃথা মানব-জন্ম লইয়া আসিয়া ছিলাম! অদূর দীপাসনে একটী মৃন্ময়-প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। মেঘাবৃত চন্দ্রালোকের ন্যায় তাহার ক্ষীণালোক রঘুনাথের দীনতার সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ছিল। প্রকৃতির মহাকোলাহলময় তরঙ্গগুলি রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের সহিত মিশাইয়া ক্রমেই ধ্যানস্তিমিতনেত্র রঘুনাথের নীরবতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। কতিপয় প্রহরী অদূরে রন্ধনব্যাপারে বসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ব্রজবুলি-সুরে মহাত্মা তুলসীদাসের ভাব-বৈচিত্র্যময় দোঁহাবলী আবৃত্তি করিতে ছিল। আর কতকগুলি দুর্গামণ্ডপ-সমাসীন রঘুনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অতি সংযত ও ধীর ভাবে পরস্পর হাস্য-কৌতুকে মগ্ন ছিল। এমন

সময়ে অন্তঃপুর হইতে দুর্গামণ্ডপের প্রবেশ-দ্বারের রুদ্ধ কবাট ক্ষীণশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল। মৃদু হইতেও মৃদুতর সেই ধ্বনি, তাহাও সতর্ক প্রহরীদের অশ্রুত রহিল না। অমনি তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কোন্ হ্যায় ?

আগন্তুকা দুইটী রমণী। একটী গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিতা যুবতী—আর একটী তাহার সহচারিণী বৃদ্ধা। বৃদ্ধা কহিলেন, মায়িজী, রঘুনাথকা পাশ যাতা হ্যায়।

প্রহরীরা সসম্ভ্রমে নতমস্তকে সরিয়া দাঁড়াইল। নৈশান্ধকারের মধ্য দিয়া সেই দুইটী রমণী ধীরপদে রঘুনাথের সম্মুখস্থ অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে প্রকোষ্ঠ-দ্বার উন্মুক্তাবস্থাতেই ছিল। যুবতী চকমকীর সাহায্যে গন্ধকলিপ্ত কাঠি দিয়া বর্ত্তিকা জ্বালিল। পরস্পর সমান্তরাল দুই দ্বারমুক্ত প্রকোষ্ঠের ক্ষীণালোক একত্রীভূত হইয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

তখন বাংলায় দেশালায়ের প্রচলন ছিল না। অগ্নিগর্ভ প্রস্তর ও লৌহের সংঘর্ষে দেশালায়ের কার্য্য নিরুপদ্রবে নির্ব্বাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে যে কার্য্য সংসাধনের জন্য গৃহস্থ-বিশেষে একদিন হইতে তিন চারি দিন অন্তর একএকটী দেশালায়ের প্রয়োজন হয় এবং যাহার প্রত্যেকটীর খুচরা মূল্য এক পয়সারও অধিক, তৎকালে সেই কার্য্য একরূপ বিনামূল্যে সম্পন্ন হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না একটী চকমকী প্রস্তর অন্যূন ত্রিংশৎ-বৎসর গৃহস্থ-বিশেষের ব্যবহারে আসিত। তাহার মূল্য দুই-চারি পয়সার অধিক ছিল না এবং গ্রীষ্ম-

বর্ষায় কোন কালে তাহার অগ্ন্যুৎপাদিকা শক্তিরও তারতম্য ঘটিত না।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, চিনিলেন কি—আগন্তুক মহিলা দুইটী কে? রেবতী আর রাঙা-দিদিমা। দিদিমা আজ বলপূর্ব্বক অনিচ্ছাভূতা রেবতীকে লইয়া দুর্গামণ্ডপে আসিয়াছেন। দিদিমার উদ্দেশ্য—তিনি আজ দেখিবেন, রঘুনাথ কেমন যোগী বা সন্ন্যাসী! তিনি আজ প্রত্যক্ষ বুঝিবেন, কেমন করিয়া রঘুর অদৃশ্য অভীষ্ট দেবতাটী আজ তাহাকে রক্ষা করে!

দিদিমা রেবতীর কানে কানে গম্ভীর মুখে বলিলেন, তরুণ যুবক রঘুর মন তোকে ভুলাতেই হবে। আমি চ'ল্লুম। সোয়ামীর জন্য লজ্জা-ভয় সব ত্যাগ করতে হয়, জানিস্ অন্নপূর্ণে!

এই বলিয়াই তিনি গজেন্দ্র-গমনে একটু ঘোমটা টানিয়া মুক্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রেবতী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়াসনোপবিষ্ট উপাসনার দেবতাটীকে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। মরি মরি, তাহা কি এত সুন্দর! ঠিক্ রক্ত-জবার মত! কাল্পনিক হিরণ্ময়-দেহধারী নহেন, সত্যই শত সূর্য্য-সমুজ্জ্বল ধ্যানের ধ্যেয় বিগ্রহ। রেবতী আপনাকে পুণ্যময়ী ও সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, নিকটে যাইয়া ধ্যানময় মহাযোগীর কি ধ্যান ভঙ্গ করিব? না— প্রভুর এ আনন্দের যোগ ভাঙিব না! অভীষ্ট দেবতা অপ্রসন্ন হইবেন। আমায় পাপ স্পর্শিবে। দুইটা কথা কহিয়াই যা

কি হইবে ? তাহাতে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মিবে। এ মাটির ধরা ত তাঁহার স্থান নহে, তাহা মাটির অনেক দূরে—অনেক উর্দ্ধে—যেস্থান মানবের পাপ নিশ্বাস-বায়ু-স্পৃষ্ট হয় না, লোক-ভয় ও মৃত্যু যেখানে আশ্রয় পায় না, যেখানকার চির-শান্তি শৌর্য্য, বীর্য্য ও মনুষ্যত্বের বিনিময়েও লাভ করা যায় না। তবে আমি তাঁহাকে সেই মাটির আসনে টানিয়া রাখিব কেন ?

একটা অব্যক্ত আনন্দে রেবতীর প্রফুল্ল চক্ষে একবিন্দু অশ্রু ঝরিল। সে আজ রাঙাদিদিমার আজ্ঞা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিল না। প্রেমতন্দ্রিত হৃদয়ে প্রকোষ্ঠের ধূলায় আঁচল পাতিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্বামীর অভীপ্সিত স্থান কি চারু মনোরম! তাহা পিতামাতার স্নেহ, আত্মীয়গণের আদর, বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি আর রেবতীর ভালবাসা হ'তেও সুন্দর! তাই সে মূর্ত্তিমতী তপস্যা স্বপ্নেই বলিতে লাগিল, যাও আমার প্রেমের দেবতা—তোমার ভগবৎ-কৃপার চির প্রিয় শান্তিধামে চলিয়া যাও। আমি হৃদয় বাঁধিয়াছি। আর তুমি এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে ক্ষণকালও থাকিও না ; আমি আর তোমার এ নিগ্রহ দেখিতে পারি না।

একটা তেপায়ার উপর প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা বায়ু-তরঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতেছিল। শয়নকালে রেবতীর তাহা নিবাইতে মনে ছিল না। বর্ত্তিকাটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। রাত্রিও আর চারি দণ্ডের অধিক নাই। শেষ রাত্রিতে প্রহরীরা সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া ছিল। রেবতীও নিদ্রিত।

রঘুনাথ কেবল বিনিদ্র! তিনি এক ভাব-রাজ্যের সুগন্ধিসুন্দর মাধুর্য্যের সারভূত প্রাসাদে থাকিয়া অমৃত-মধু পান করিতে করিতে বিহ্বল হইতে ছিলেন। পরিশেষে সে অমৃতের মাদকতায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবোন্মত্ত সাধক পুলকে গাত্রোত্থান করিলেন। তখনও তিনি যেন দেখিতেছেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া গৌড়ীয়-গৌরভক্তগণ সানন্দে নীলাচলে ছুটিতেছেন। তিনি অমনি "হায় হায় আমার অদৃষ্টে প্রভু-দর্শন ঘটিল না" বলিয়া যেমন বিশ্লিষ্ট ঝটিকার বেগে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন, তখনি সম্মুখস্থ দীপালোকোদ্ভাসিত প্রকোষ্ঠে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল! অমনি তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভাবের নেশা কাটিয়া গেল। যদি শত গ্রহসহ গ্রহাধিপতি সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হইয়া তৎকালে তাঁহার সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইত, তা হ'লেও বুঝি তিনি ততদূর বিস্মিত হইতেন না। প্রকোষ্ঠে রেবতী শায়িত, অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। সম্ভাবনাকে কোন মতে মনে স্থান দিতে পারিলেন না। কারণ রেবতী যে তাঁহাকে আত্ম-বলিদান করিয়াছে, তাহার পরিচয় তিনি সর্ব্বতোভাবে পাইয়া ছিলেন। তাই তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তি-শিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলতায় জ্বলিতে ছিল। তিনি সংযত দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বলালোকে রেবতীকে স্পষ্ট দেখিলেন। রঘুনাথ ক্ষণপূর্ব্বে যাহাকে আসক্তির লীলাক্ষেত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া ছিলেন, এখন সেই নয়নরম্যা রেবতীর প্রেমময়ী মূর্ত্তিটী তাহার প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি

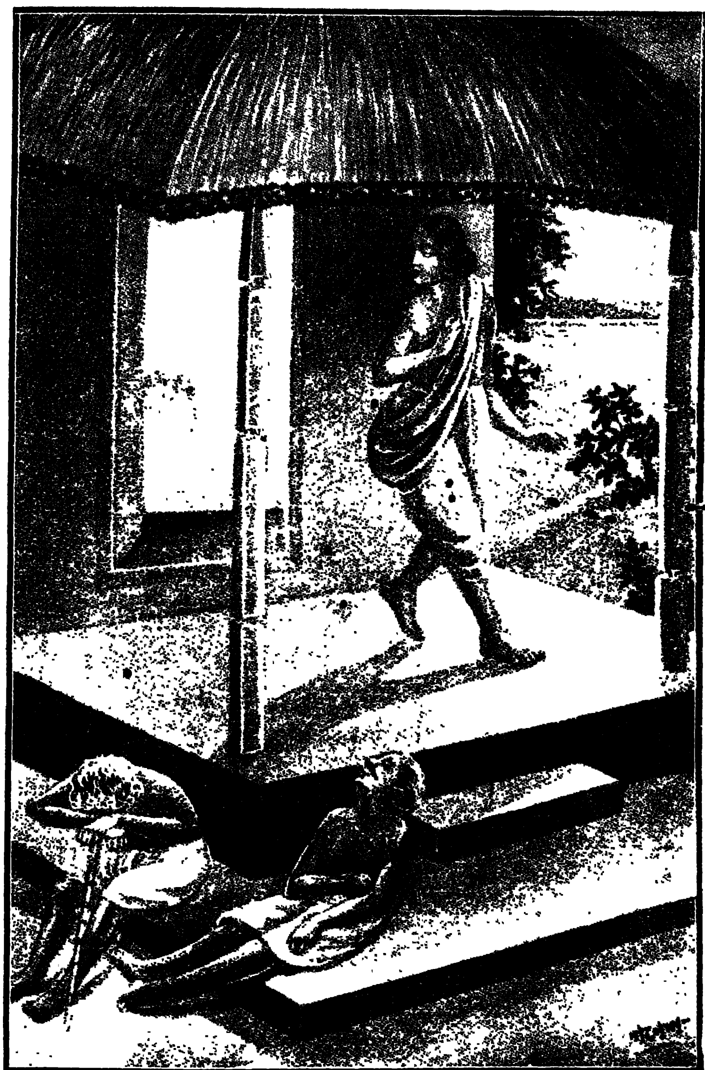
দিয়া বিদায় বরণ করিতেছে। রঘুনাথ আপনাকে ধন্য ভাবিয়া নিঃশব্দে প্রণয়িনীকে দেখিতে দেখিতে মনে মনে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রেবতীর প্রকোষ্ঠের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ হইল।

* * *

রেবতীর ভগ্ন অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার তন্দ্রাও ভাঙিল। তখন গাঢ় অন্ধকার প্রেতের আকারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে ছিল। আলুথালুবেশা পতিবিরহিণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া উন্মাদিনী নিশাচরীর ন্যায় সেই, অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে, চত্বরে ও মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে তাহার অভীষ্ট-রত্নের অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু হায় কোথায় সে! অয়ি নিশীথিনি! বলিয়া দাও— পাগলিনীর কাম্যরত্নটী তুমি তোমার অঙ্কপথে পথ দিয়া কোথায় পাঠাইলে?

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

মণ্ডপের অনতিদূরে প্রহরীরা জানুদেশে মস্তক রাখিয়া সারসপক্ষীর ন্যায় অন্ধভাবে বসিয়া ছিল। রঘুনাথের গমনের বাধা দিবার আর কেহই ছিল না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রাঙ্গণ-চত্বরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, আকাঙ্ক্ষিত মধুর সুযোগমুহূর্ত্ত অনাহূতভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ইহা বিধাতার



রঘুনাথের গৃহত্যাগ।

দান! নতুবা এই শেষ নিশীথে পুর-হিতকামী শ্রীগুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত কেন? ইনিও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত, শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জনৈক অন্তরঙ্গ শিষ্য। যদুনন্দন রঘুনাথের নিকট তাঁহার নিজ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া ছিলেন।

রঘুনাথ যথা সময়ে শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে ভক্তি-ভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, প্রভু এই শেষ রাত্রিতে কি জন্য আগমন করিয়াছেন?

যদুনন্দন তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে বলিতে রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রাঙ্গণ-বহির্ভাগস্থ প্রকাশ্য পথে উপস্থিত হইলেন। এ রহস্য কে বুঝিবে? ভক্ত ও ভগবানের লীলা কি বুঝিবার? তবে প্রাণের আকুলতা ইচ্ছা-শক্তিরই জয় ঘোষণা করে। তাহাই হইল। রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যসম্মিলনের সহায়তায় যে তাঁহার শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎকার, ইহাই সহজ বোধ্য!

যদুনন্দনের বক্তব্য শেষ হইলে রঘুনাথ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবও নিজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্খল-মুক্ত পক্ষী এখন স্বাধীন। পিঞ্জরে থাকিয়া সে যে বুলি অভ্যাস করিয়া ছিল, সেই মধুর বুলি ভাবিতে ভাবিতে

নক্ষত্র-জগতের স্নিগ্ধালোকমণ্ডিতা শ্যাম-শোভাময়ী প্রকৃতির মুকুলিত কুসুম-কাননের দিকে ছুটিল। সেবক, রক্ষা ও প্রহরী কেহই আর নিকটে নাই। নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল রঘুনাথ কায়মনঃ-প্রাণে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। আজ যেন তাঁহার হৃদয়ের সহস্র দ্বার দিয়া প্রাণের আবেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। জীবন সার্থক বোধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি যেন কাহার পদ-শব্দ শুনিতে পাইলেন। অমনি গ্রাম্য সুপথ ত্যাগ করিয়া বন্য বিপথে প্রবেশ করিলেন। এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চান, আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হন, উদ্দেশ্য কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে কিনা। তৎকালে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিও তাঁহাকে চকিত্র করিতে ছিল। পাখীর ডাকেও শিহরণ আসিতে ছিল! ভাবনা—হয় ত বা অনুকূল ভাগ্য পুনর্ব্বার গ্রহচক্রে প্রতিকূল হয়। প্রতিমুহূর্ত্ত যেন যুগ-যুগান্তর বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে রজনী একটী বিষাদিনী রমণীর হাসি হাসিয়া তাহার শেষযাত্রা-পথের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ আবার পদ-শব্দ!

"নিশ্চয়ই পিতৃদেবনিয়োজিত প্রহরীসকল আমার অনু-সন্ধান নিমিত্ত আসিতেছে" বিবেচনায় রঘুনাথ বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। কখন সবুজ বনের সবুজ গাছের আড়ালে, কখন বা তপস্যামগ্ন ঋষির সদৃশ বন্য ঝোপের মধ্যে আপনাকে লুকাইতে ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। মহাজনের কূললগ্ন বাণিজ্য-

তরী-নিমজ্জনের বিষাদের মত একটা অন্তঃস্থলভেদী বিষাদ তাঁহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। ক্রমে প্রভাত হইল। সুপ্তোত্থিত বিশ্বমূর্ত্তি কি সুন্দর! তরুণ অরুণরাগরঞ্জিত লোহিতবর্ণ পূর্ব্বদিক্ যেন তাহার চক্ষুস্বরূপ হইয়া সকলকে দেখিতে ছিল। পাখীরা তাহার বাক্‌শক্তিরূপে ঐকতানে জাগরণের গান গাহিয়া উঠিল। ঊষার রক্ত-আলোকচ্ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া তাহার পরিচ্ছদে পরিণত হইল। শীতল বায়ু তাহার নিশ্বাসরূপে বহিতে লাগিল।

রঘুনাথ মহোল্লাসে বিশ্বের সহিত বিশ্বেশ্বরের মহামূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এক দিনেই পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রমণ করিলেন। দিবার পর আবার সন্ধ্যা আসিল। সূর্য্যাস্ত হইতেছে। ক্লান্ত রঘুনাথ গোধূলিকালে এক গোপের বাথানে আশ্রয় লইলেন। হৃদয়বান্ গৃহাশ্রমী গোপ আপনাকে ভাগ্যবান্ মানিয়া শুষ্কমুখ রঘুনাথকে দুগ্ধ পান করাইয়া আতিথ্যসৎকার করিল। সে রাত্রি তিনি সেই খানেই অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে গোপের নিকট নম্রভাবে বিদায় লইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

* * * *

এদিকে নিদ্রাভগ্ন রক্ষক-প্রহরীরা রঘুনাথকে দুর্গামণ্ডপে দেখিতে না পাইয়া একটা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ রঘুনাথের পলায়নের সংবাদ গোবর্দ্ধনের শ্রুতিগোচর হইল।

তিনি "কি করিবেন, কি হইবে, কি উপায়ে রঘুনাথকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন" ইত্যাদি চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তথাপি অনুমান করিলেন যে, "কয়েক দিন পূর্ব্বে শিবানন্দপ্রভৃতি গৌড়ীয় গৌরভক্তগণ মহাপ্রভু-দর্শন-কামনায় নীলাচলে যাইতেছেন, সুতরাং আমার প্রাণের রঘুনাথও যে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

এই অনুমান স্থির করিয়াই তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ শিবানন্দকে পত্র লিখিলেন, "তুমি আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিবে। দশজন বলিষ্ঠ পদাতি পাঠাইতেছি, রঘুনাথ আসিতে অস্বীকৃত হইলে বাঁধিয়া আনিবে। কদাপি তাহাকে সঙ্গে লইও না।"

পত্র লইয়া দশজন পদাতি ত্বরিতপদে অমনি ছুটিল। কয়েক দিন পরেই পদাতিগণ ঝাঁকরা নামক গ্রামে শিবানন্দপ্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ পাইল। এই ঝাঁকরা গ্রামটী বর্ত্তমানে বোধ হয়, হাওড়া জেলান্তর্গত আমতা থানার অধীন ঝিঁকিরা গ্রামের মৌলিক নাম।

যাহা হউক গোবর্দ্ধনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। পদাতিগণ শিবানন্দকে পত্র দিয়া রঘুনাথের সমাচার জানিতে ব্যগ্র হইল। চারিদিক অনুসন্ধানও করিতে লাগিল, কিন্তু কৈ—রঘুনাথ কোথায়? পত্রপাঠে শিবানন্দ বিস্মিত নেত্রে অসঙ্কোচে কহিলেন, কৈ রঘুনাথ ত আমাদের সহিত আসে নাই। সুতরাং পদাতি-সকল ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ক্ষুব্ধ প্রাণে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত

হইল এবং যথা দিনে যথা সংবাদ দাসমহাশয়দিগের গোচর করিল। তাঁহারা "ভবিষ্যকল্পনা সত্যে পরিণত হইয়াছে" ভাবিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই যেন জীবন্মৃত্যু ঘটিল। সেইদিন হইতেই তাঁহাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও চঞ্চলা হইলেন। যে অন্ধকারে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, সে অন্ধকার আর সে পুরী হইতে কখন অপসৃত হইল না। প্রতি-মুহূর্ত্তে যেন দুর্ভাগ্য-পেচক বিকট কর্কশ চীৎকার করিতে লাগিল। দৈত্যবেশী দৈন্য দিন দিন নব-সজ্জায় অলক্ষ্যে দাস-মহাশয়দিগের সংসার-রাজ্য অধিকার করিতে অবসর পাইল। সেই আনন্দময়ী যুথিকাশুভ্রা পুরী শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দুর ন্যায় রঘুনাথের বিরহসম্পাতে কিঞ্চিৎ দুষ্ট হইলেও নিত্য পরিবর্ত্তন-প্রিয়া প্রকৃতির গতি-প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্রই শোকাবহ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিল। হায়—এই সংসার! এই তাহার শ্রী-সৌন্দর্য্য! এই আবার তাহার নিমিত্ত অভিমান!

মাল্যকর উদ্যান প্রস্তুত করিয়া নানা জাতীয় পুষ্পবীজ রোপণ করে। কালে সেই উদ্যানে চারুপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহার অতি আনন্দ! সে আনন্দ রাখিবারও সে স্থান পায় না। কিন্তু যখন আবার ধ্বংস-কীট প্রবেশ করিয়া সেই শোভাস্পদ উদ্যান নষ্ট করে, তখন? তখন সেই হর্ষের বিনিময়ে যে দুঃখ-যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সেই আনন্দের পরিমাণাপেক্ষা অনেক বৃহৎ—অনেক গুরু। বৃক্ষে বজ্র পতিত হইলেই যে বৃক্ষটী মাত্র দগ্ধ হয়, এমন নহে; তাহার সঙ্গে নিকটস্থ অন্যান্য

তরু-গুল্ম-লতাদিও ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। সেইরূপ দাসমহাশয়দিগের সংসার-উদ্যানও ভস্মরেণুর অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন এই দুঃসংবাদের সময় হইতেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ হিরণ্য ভ্রাতার অনুকরণে বিস্মৃত হন নাই। বন্ধ্যা অলকা এতদিনে আপনাকে প্রকৃতই বন্ধ্যা ভাবিয়া শেষাবস্থার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজয়া মাতৃ-প্রাণে সন্তান-বাৎসল্যের বিরহ-বেদনা আর কত সহিবে? উন্মাদিনী হইয়া পার্থিব-জ্বালার হাত এড়াইলেন। সাবিত্রীরূপিণী রেবতী সত্যই সংসার ত্যাগিনী যোগিনী সাজিল। দাসমহাশয়দিগের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রাণহীন শবের পরিম্লান-মূর্ত্তির বিকট শুষ্ক দৃশ্য যেন দিন দিন ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইতে লাগিল।

রঘুনাথ উপপথে যাইতে যাইতে কিছুদিনের পর পূর্ব্বমুখ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণমুখী হইলেন। ক্রমাগত এই ভাবেই চলিতেছেন। আহার-নিদ্রা আদৌ নাই। শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তিই জীবনের একমাত্র মূল আকাঙ্ক্ষা। প্রাণধারণার্থ কোন দিন বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ, কোন দিন ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল রন্ধন, কোন দিন বা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান। যে দিন যাহা সহজে পাইতেন, তাহাই তাঁহার প্রাণরক্ষার উপায় প্রধান আহারীয় হইয়াছিল। তিনি দ্বাদশ দিনে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বাদশ দিনের মধ্যে তিনি তিনদিনমাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ছিলেন। একমাত্র চৈতন্য-প্রাপ্তিই তাঁহার জপমালা হইয়া ছিল। কোনস্থানে কোন দিন আহারের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। দ্বাদশ দিনের

পর যে ক্ষণমুহূর্ত্তে তিনি শ্রীচৈতন্য-শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন, তখন মহাপ্রভু, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও স্বরূপ দামোদরপ্রভৃতি ভক্ত-সহ শাস্ত্রানুশীলন করিতে ছিলেন। চৈতন্যগতপ্রাণ শ্রীরঘুনাথ অদূর অঙ্গন হইতে মহাপ্রভুকে দেখিয়া সেইখানে প্রণত রহিলেন। মুকুন্দ রঘুনাথকে চিনিতেন, তিনি রঘুনাথকে তটস্থ ও সমীপগত দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে কহিলেন, প্রভু দেখুন দেখুন, আমাদের রঘুনাথ আসিয়াছে। দয়াল প্রভু অমনি কোটীপতি-পুত্রের দারিদ্র্য ও দৈন্যবেশাদি দর্শনে আর্দ্র ও বিস্মিত হৃদয়ে দ্রুতপদে গিয়া "এস এস রঘুনাথ" বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথ ধন্য হইলেন! তাঁহার ভক্তিপ্রাণ আনন্দে একেবারে দ্রব হইয়া গেল। তিনি সাগ্রহে ও ভক্তিসহকারে মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদসকলের পদধূলি লইলেন। মহাপ্রভু পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অপার অনুগ্রহ দেখিয়া সমাগত ভক্তকুল জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল! মহাপ্রভুর মহানন্দের বন্যা অমনি বহিল! তিনি তাহাতে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন, ধন্য রঘুনাথ, তুমিই ধন্য! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুপম অনুগ্রহ! অতুল কৃপা! তাঁহার কৃপাবলই শ্রেষ্ঠ বল! নতুবা সে হেন বিষয়-বিবর হইতে কে তোমায় পরিত্রাণ করিতে পারে?

রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতেন না, শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণই তাঁহার ধ্যেয় আরাধ্য সামগ্রী! তাহাই তাঁহার সর্ব্বস্ব! তাই তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রভু, আমি আপনাকে ভিন্ন অন্য

শ্রীকৃষ্ণ জানি নাই। আপনিই আমার হৃদ্‌বিহারী পদ্মপলাশ-লোচন বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ! আপনার কৃপাবলেই আমি বিষয়-বিবর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি।

দয়াল প্রভু রঘুনাথের একাগ্রতা দেখিয়া আবার বলিলেন, রঘুনাথ, আমি তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বিশেষ রূপে চিনি। তাঁহারা উভয়েই বিষয়ী ও বিষয়-কীট, বিষয়-বিষের পীড়াও তাঁহাদের সুখকর। যাহাই হউক, তুমি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-বলেই সেই মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে রঘুনাথের ক্ষীণমলিন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নয়ন-পদ্ম হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর্দ্রকণ্ঠে স্বরূপকে বলিলেন, দেখ স্বরূপ, আমি তোমার হস্তে আমার রঘুনাথকে সমর্পণ করিলাম। রঘুনাথ আমার জন্য তাহার কি শরীর কি করিয়াছে দেখ। তাই বলিতেছি, তুমি আমার রঘুনাথকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজ পর্য্যন্ত আমার নিকট তিনটী রঘুনাথ নামক ভক্ত আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। কিন্তু এই রঘুনাথ "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে আখ্যাত হইবে। তুমি আমার পুত্র বা ভৃত্যস্বরূপ! ইহাই অঙ্গীকার কর।

স্বরূপ নত-মস্তকে সানন্দে তাহাই প্রভুর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভক্ত-বৎসল ভক্ত-সখা প্রাণচৈতন্য গোবিন্দকে বলিলেন, দেখ গোবিন্দ! আমার রঘুনাথের অবস্থা! আমার জন্য সে দ্বাদশ দিনের মধ্যে তিনদিনমাত্র জীবনরক্ষণোপযোগী

যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়াছে। সুতরাং তুমি কিছুদিন আমার রঘুনাথের শুশ্রূষা করিও। ইহার শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও।

আবার সস্নেহে রঘুনাথকে বলিলেন, যাও রঘুনাথ, সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রভু নীলাচলনাথকে দর্শন করিয়া আইস, তাহার পর প্রসাদ পাইবে।

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর অসীম কৃপা দেখিয়া সমাগত সকল ভক্তই তাঁহার ভাগ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও মধ্যাহ্ন-কার্য্য সমাপনের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের এইরূপই স্নেহ! এমনই দয়া!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন উৎকলের নীলাচলের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিব। ইহা ভারতের দক্ষিণ মহানদী ও বঙ্গোপসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্র ও পুরুষোত্তম তীর্থ নীলগিরি পর্ব্বতের প্রত্যন্ত প্রদেশে বর্ত্তমান। তজ্জন্য শ্রীক্ষেত্রের অপর নাম নীলাচল। নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও কপিলসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার সম্যক্ ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। এই জগন্নাথক্ষেত্র হিন্দুদিগের অতি আদরের ও পরম পুণ্য স্থান। এখানে সকলেই বিশ্বজনীন-প্রেমের প্রেমিক হইয়া জাতি-বর্ণের বৈশিষ্ট্য না রাখিয়া মহানন্দে

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর ভক্তিমুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ দারুব্রহ্মরূপে এই নীলাচলে সর্ব্বদা বিরাজমান। যে নয়নরম্য দর্শনীয় বিবিধ কারুময় সুন্দর মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিতেছেন, তাহা অতি প্রাচীন ও একটী প্রকাণ্ড দুর্গ-বিশেষ বলিলেও হয়। তাহার একটীমাত্র দ্বার। সূর্য্যরশ্মি আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত সুগন্ধিপ্রদীপ সে স্থানের নিবিড় তমঃ দূর করিতেছে। মন্দিরমধ্যে চারিফুট উচ্চ ও ষোলফুট দীর্ঘ একটী প্রস্তরনির্ম্মিত রত্নবেদি। তাহারই উপরে দারুব্রহ্ম-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীজগন্নাথ, দক্ষিণে বলরাম ও মধ্যে সুভদ্রা মূর্ত্তি। বাম-দিকে সুদর্শনের চক্রমূর্ত্তি। বেদির নিম্নে স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি, রজতময়ী বিশ্বধাত্রীমূর্ত্তি, পিত্তলময়ী মাধবমূর্ত্তি। এখানকার পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন, এই রত্নবেদির মধ্যে একলক্ষ শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত। এইখানে প্রজাপতি দক্ষকন্যা সতীর নাভি পতিত হইয়াছিল। হিন্দুর এই পবিত্র ক্ষেত্রে অনেক দেবমন্দির ও অন্যান্য বহু তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ, শ্রীরামচন্দ্র, বদরীনারায়ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, ইন্দ্রাণী, সূর্য্য-মূর্ত্তি, বটেশ্বরলিঙ্গ, ক্ষেত্রপাল, মুক্তিমণ্ডপ, ভাণ্ডগণেশ, নীলমাধব, সর্ব্বমঙ্গলা, রোহিণীকুণ্ড, লক্ষ্মী, রাধা, সরস্বতী, নরেন্দ্রসরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, গুণ্ডিচাবাড়ী, শ্বেতগঙ্গা, কপালমোচন, চক্রতীর্থ, শ্রীনিমাই-চৈতন্যমঠ, বিদুরাশ্রম, মুলুক-বাবাজীর মঠ, সুদামাপুরী, নানক ও কবীরপন্থী মঠ, শঙ্করাচার্য্য মঠ,

লোকনাথ, আঠারনালাপ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির ও মূর্ত্তির সম্বন্ধে পৌরাণিক যুগের নানা আখ্যায়িকা শোনা যায়। পুরাণকারগণ বলেন, নীলাচলে পুরুষোত্তম তীর্থ নামক এক মহাতীর্থ ছিল। অবন্তিরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই তীর্থ দর্শনে তথায় আগমন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সেস্থানে তাহার কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন না। লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলেন, যুগান্তের ভীষণ ঝঞ্ঝায় ও সমুদ্রের প্রবল বন্যায় বিপুল বালুকাস্তূপে সেই তীর্থ লোপ পাইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত রাজা আর গৃহে ফিরিলেন না। তদুদ্ধারে তথায় বসিয়া মহাতপস্যায় মগ্ন হইলেন। অসাধ্য সাধনায় মহারাজের মনোরথ সিদ্ধ হইল। ভগবান স্বয়ং আসিয়া দর্শন ও উপদেশ দান করিলেন। পরে বিশ্বকর্ম্মা মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক যে মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কালগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গ ভীমদেব তাৎকালিক চল্লিশ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। আরও বলেন, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে মূর্ত্তি দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, তাহা হস্তপদাদিযুক্ত পরম সুন্দর ছিল। উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে হিন্দবৈরী স্বনাম-প্রসিদ্ধ মুসলমান সেনাপতি দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় সে মূর্ত্তি অগ্নিযোগে অর্দ্ধদগ্ধ করেন। তদবস্থায় কোন মহাপুরুষ তাহা আনয়নপূর্ব্বক

কুজঙ্গ দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষা করিয়া ছিলেন। পরে আকবরের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্রদেব হিন্দুশাস্ত্র মতে নিম্বকাষ্ঠে এই বর্ত্তমান জগন্নাথদেবের নব কলেবর প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যৎকালে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, তখন সেই দগ্ধ মূর্ত্তির হস্তপদাঙ্গুলি না থাকায় ভ্রমবশতঃ তাহারই অনুকরণে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া ছিল। কপিল-সংহিতায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তির বিষয় সবিশেষ বর্ণিত আছে। তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চিত্তহারক। বর্ত্তমানে এই শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক মুগনিপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রাজা পুরুষোত্তম ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। এই প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চারিটী বৃহৎ দ্বার। পূর্ব্ব দিকের দ্বারের নাম সিংহ-দ্বার। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটী সিংহ মূর্ত্তি। তাহার পুরোভাগে ৪২ ফুট উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সুমসৃণ অরুণস্তম্ভ। উত্তর দ্বারের নাম হস্তি-দ্বার। পশ্চিম দ্বারের নাম খাঞ্জা দ্বার এবং দক্ষিণ দ্বারের নাম অশ্ব-দ্বার। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী অশ্ব মূর্ত্তি। মনে হয়, যে যে দ্বারে যে যে মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট, সেই মূর্ত্তিগুলির নামানুসারেই দ্বারের নামকরণ হইয়াছে। ইহার কিয়দ্দূর যাইলেই দক্ষিণ সমুদ্র। আহা তাহা কি সুন্দর! কি চারু মনোহর। সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি, তদূর্দ্ধে অনন্ত অসীম নীলাকাশ। সেই নীল জলরাশি আবার দূরে গিয়া অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়াছে। বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা পর্য্যায়ক্রমে তথা হইতে সেই অদ্ভুত মিলন-সংবাদ

আনিয়া সৈকত-বাসীকে জানাইতেছে। একটী না যাইতে অপর একটী আসিয়া বেলাতটে আহত হইয়া পড়িতেছে। সেই নীল-শ্বেতাভ-সম্মিলন অতি সুন্দর দৃশ্য!

রঘুনাথ সেই সিন্ধু-জলে স্নান করিয়া ভগবান পুরুষোত্তম-দেবকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যাশ্রমে ফিরিলেন; গোবিন্দ অমনি মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। রঘুনাথও আপনাকে ধন্য ও সার্থক বিবেচনায় তাহা প্রসন্ন চিত্তে ভক্তি-সহকারে লইলেন। এইরূপে পাঁচদিন কাটিয়া গেল। তাহার পর আর তিনি প্রভুর প্রসাদ পাইতে গোবিন্দের নিকট যাইতেন না। কারণ পাঁচ দিনের পর রঘুনাথ দেখিলেন, গোবিন্দদত্ত পাত্রে প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট কোনও আহারীয় দ্রব্য নাই, মাত্র পুষ্পাঞ্জলি শোভা পাইতেছে। তখনই তিনি বুঝিলেন, ইহা মহাপ্রভুর পরীক্ষা। তিনি আজ আমাকে প্রসাদ না দিয়া বৈরাগীর ধর্ম্মাচরণ-শিক্ষা দিতেছেন। আবার মনে স্থির করিলেন, বৈরাগীকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে নাই; ভিক্ষায় জীবন-রক্ষা করিতে হয়। পর-মুখাপেক্ষী বৈরাগী কখনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহাকে ভগবান উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার পরমার্থ ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং শাক, পত্র, ফল ও মূলে উদরপূরণই বৈরাগীর ধর্ম্ম। যে বৈরাগী বাসনার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সে হতভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব আমি আর অনায়াসলভ্য-প্রসাদে জীবন

ধারণ করিবেনা। সেই দিন হইতে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পে রঘুনাথ ভিক্ষায় প্রাণ ধারণের জন্য সারা দিনের পর রাত্রি দশ দণ্ডের সময় জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে তটস্থ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কেন না, জগন্নাথ-সেবক ও তাঁহার দর্শন-যাত্রীদের নিয়ম এই যে, অন্নার্থী অভুক্ত বৈষ্ণবগণকে অন্নাহার না করাইয়া গৃহে আসিতে নাই। সেইদিন হইতে বাংলাধিপতির একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ সেই ভিক্ষান্নে দিনান্তে রাত্রিকালে একবারমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কি কঠোর ব্রত! কি সংযম-সাধনা-শিক্ষা! কি দৃঢ় অধ্যবসায়!

ধন্য রঘুনাথ! তুমিই ধন্য! তোমার এ ত্যাগস্বীকার সমগ্র-বিশ্বের বিজয়-স্তম্ভ!

একদিন রঘুনাথ স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রভু, বৈষ্ণবের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি? আমি যাহার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ দান করুন।

রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সম্মুখে কোন কথা কহিতেন না, রক্ষক স্বরূপের দ্বারাই তাঁহার কথোপকথন চলিত। রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রশ্নের উত্তর শুনিবার নিমিত্তই স্বরূপকে এই প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। স্বরূপও তাহা বুঝিয়া সেইদিন রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। রঘুনাথও তখন মনের আবেগে প্রভুকে কহিলেন, হে দয়াময়! হে পতিতপাবন! হে দীননাথ! আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি জানি না। আপনার শ্রীমুখে তাহাই শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।

তখন দীনের ঠাকুর চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, রঘুনাথ! আমি স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টারূপে দিয়াছি। সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমাপেক্ষা স্বরূপই সমধিক জ্ঞানী। তুমি স্বরূপের নিকটেই তাহা শিক্ষা করিবে। তথাপি তুমি যখন আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তখন বৈরাগীর ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, মনে করিয়া রাখিও। এই বলিয়া তিনি স্থির ও গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন।

১। গ্রাম্য-কথা শুনিও না।

২। গ্রাম্য-বার্ত্তা কহিও না।

৩। উত্তম খাদ্য ও উত্তম পরিচ্ছদ, বৈরাগীর চির-বর্জ্জনীয়।

৪। সংসার-সিন্ধুর পারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ-নাম সর্ব্বদা জপ করিবে।

৫। ব্রজ-ধামে যাইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা-মনন করিবে।

প্রভু মুখ-নিঃসৃত এই পাঁচটি উপদেশে রঘুনাথ ধন্য হইয়া প্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুও অমনি তাঁহাকে স্নেহাকুলিত প্রাণে কৃপালিঙ্গন দানে পুনর্ব্বার স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথের গৃহত্যাগের পূর্ব্ব হইতে যে সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব নীলাচলে আসিতে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে বেলাক্রান্ত তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন। সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য ও ভাগবত শিবানন্দ সেন সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা উভয়ই রঘুনাথকে কৃপা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। শিবানন্দ পথমধ্যে গোবর্দ্ধনের যে আদেশ-লিপি পাইয়াছিলেন, সে সমুদায় বিবরণই রঘুনাথকে বলিলেন।

রঘুনাথ তখন মায়াত্যাগী প্রকৃত বৈরাগী। বিষয় জ্ঞান হারাইয়া নিয়ত শ্রীগৌরাঙ্গ-পদ-সেবায় নিরত হইয়া ছিলেন। তাঁহার সে নিষ্ঠা এখনও পাষাণ-খোদিত রেখার ন্যায় অমর হইয়া রহিয়াছে। সে সময় তাঁহার সার্দ্ধ-সপ্ত-প্রহর নামজপে অতিবাহিত এবং অবশিষ্ট কাল আহার ও নিদ্রায় ব্যয়িত হইত। কোন দিন অনাহারে থাকিতেন; কোন দিন বা প্রাণ-রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। তাহাও আবার কোন রসময় সুস্বাদু দ্রব্য নহে। ছিন্নকন্থা ও ক্ষুদ্র কৌপীন ব্যবহার করিতেন। এরূপ কঠোর বৈরাগ্যের দুঃসহ চিত্র কেহ কখন দর্শন করেন নাই। রঘুনাথের বৈরাগ্য অতি প্রেমসঙ্কুল ও অদ্ভুত। মহাযোগীরও আদর্শ।

প্রভুর আদেশে গৌড়ীয় ভক্তগণ ক্রমে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেই সঙ্গে শিবানন্দও চলিয়া গেলেন। চারি মাসের পর গোবর্দ্ধন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জীবনাধিক রঘুনাথ মহাপ্রভুর সঙ্গ-রূপ মহাসিন্ধুতে মিশিয়াছে। শুনিবামাত্র তিনি পুত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার আশায় শিবানন্দের নিকট তাঁহার একটী বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রেরণ করিলেন। যথা সময়ে শিবানন্দের বাটীতে গোবর্দ্ধনের প্রেরিত লোকটীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, বলিতে পারেন, সাতগাঁর ভূস্বামী গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ কি নালাচলে রহিয়াছেন ?

"হাঁ, রহিয়াছেন।"

"তাঁহার সহিত কি আপনার পরিচয় হইয়া ছিল ?

"রঘুনাথ আমার যথেষ্ট পরিচিত।"

"এখন তিনি কোথায় এবং কি অবস্থায় রহিয়াছেন, আপনি জানেন কি ?"

"জানি, তিনি এখন নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট।"

"সেখানে কি করিতেছেন ?"

"মহাপ্রভুর সেবা ও পূজা।"

"বাটীতে আসিবেন না ?"

"কিরূপে বলিব বাবা, মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা ?"

"কেন পিতৃমাতৃত্যাগী পুত্রের ইচ্ছা কি আপনি বলিতে পারেন না ?"

"কেমন করিয়া বলিব বাবা! সেই মায়াত্যাগী বৈরাগী ত সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণই সার করিয়াছে। নামসঙ্কীর্ত্তন ও জপ-পূজাদিই তাহার মুখ্য কর্ম্ম। ভক্ষ্য ও পরিধেয়ের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই। যেখানে সেখানে অতি সামান্য আহার করিয়াই সে তৃপ্ত! প্রাণটী রাখিয়াছে মাত্র!

তিনি আরও কত কি বলিবার উপক্রম করিতে ছিলেন, কিন্তু আগন্তুক তাহার আগমন পণ্ডশ্রম ভাবিয়া স্তম্ভিত ভাবে ছল-ছল-নেত্রে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যথা সময়ে গোবর্দ্ধন তাঁহার প্রেরিত লোক-প্রমুখাৎ পুত্রের কৃচ্ছ্র-সাধনার সংবাদ পাইলেন। অমনি বিশ্ব-ব্যাপী নৈরাশ্য মহানিশার অন্ধকারের মত শূন্য হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। বুকে কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবেশ করাইলেও বোধ হয়, তাঁহার তাদৃশ বেদনা অনুভূত হইত না। মনে যে অগ্নি-শিখা প্রবল ও রুদ্র ভাবে জ্বলিতে ছিল, তাহা যেন ধ্বংস-যুগের বজ্রাগ্নির ন্যায় নাচিয়া উঠিল। চির মধুরা শান্তপ্রকৃতি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাতেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ভয় বা অশ্রু পতিত হইল না। দেখা গেল, জীবের শেষ-যন্ত্রণার অগ্নি-গোলক তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে দলন করিতেছে। তিনি প্রাণহীন শবের মত নির্লিপ্ত ভাবে সে যন্ত্রণা সহিয়া যাইতেছেন। বিজয়া তখন পাগলিনী। তথাপি এই দারুণ সংবাদে উম্মাদিনীর

প্রাণও শিহরিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন অনেক ভাবিয়া রঘুনাথের জন্য দুইটী ভৃত্য ও একটী ব্রাহ্মণের সহিত চারিশত মুদ্রা দিয়া শিবানন্দের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিলেন।

তাহারা শিবানন্দকে গিয়া তাহাদের আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিল। শিবানন্দ বলিলেন, পথে দস্যু-তস্করের ভয়. মুদ্রাসহ কয়েকজনে যাইতে সমর্থ হইবে না, উপস্থিত অপেক্ষা কর, আমরা যে সময়ে যাইব, তোমাদিগকে সঙ্গে লইব।

তাহারা শিবানন্দের উপদেশে গৃহে ফিরিল! এক বৎসরের পর যখন শিবানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ নীলাচলে পুনর্যাত্রা করিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইলেন।

* * * *

রঘুনাথ কিছুতেই পিতৃদত্ত মুদ্রা ও তাঁহার প্রেরিত ভৃত্য ও বিপ্র নিকটে রাখিতে চাহিলেন না। কিন্তু তাহারাও কিছুতেই নীলাচল ত্যাগ করিল না। প্রতিদিনই কাতর-বিনয়ে রঘুনাথের নিকট আসিয়া তাহাদের আকুল-প্রার্থনা জানাইত। সেই কাতর-প্রার্থনায় দয়াপ্রাণ রঘুনাথ অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে সম্মতি দিলেন এবং পিতৃ-প্রদত্ত মুদ্রার মধ্যে আটপণ কড়ি মাসিক দুইবার গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ন্যূনাধিক দুই বৎসর রঘুনাথ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহার পর আর তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন না।

তাই মহাপ্রভু স্বরূপকে একদিন বলিলেন, দেখ স্বরূপ, বলিতে পার কি, রঘুনাথ আর কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করে না ? স্বরূপ বলিলেন, রঘুনাথ মনে বিচার করিয়াছে, বিষয়ীর অর্থ লইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা আমার বিহিত হয় নাই। কেন না বিষয়ীর অর্থে চিত্ত মলিন হইয়া থাকে। রঘুনাথ আরও বলে, প্রভুও তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন এবং আমারও মন তাহা চায় না। আমি কেবল ভৃত্য ও বিপ্র বাক্যে এই কার্য্য করিয়াছি। প্রভু আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন বলিয়াই আমার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি মূঢ়, দুঃখিত হইব বলিয়াই তাহা তিনি উপেক্ষা করেন নাই।

মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, স্বরূপ, আমার রঘুনাথ যথার্থ অনুমান করিয়াছে। বিষয়ীর রাজস অন্নে অন্তঃকরণ মলিন ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। ম্লান ও দুর্ব্বল মনে কৃষ্ণারাধনা হয় না। ইহাতে দাতা ও ভোক্তার চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। আমার রঘুনাথ সত্যই অনুমান করিয়াছে যে, আমি তাহারই প্রীতির নিমিত্ত তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম। এখন সে যে নিজে বুঝিয়া এই কার্য্যে বিরত হইয়াছে, ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

কিছুদিনের পর রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তিও ত্যাগ করিলেন। ছত্রান্নই জীবিকা হইল।

মহাপ্রভু গোবিন্দের প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া আর একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গা স্বরূপ, তুমি

কি জান, রঘুনাথ আর কেন সিংহদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় না?

স্বরূপ কহিলেন, রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষা-বৃত্তিতে অতিশয় দুঃখানুভব করিয়াছে।

মহাপ্রভুও দুঃখিত কণ্ঠে বলিলেন, তাহা হইলে তাহার জীবিকোপায়?

"মধ্যাহ্নে ছত্রান্নে।"

বিস্মিত ভাবে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, ছত্রান্নে? পুনঃ সোৎসাহে কহিলেন, ভাল, ভাল, উত্তম করিয়াছে, সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তি, অতি ঘৃণ্য, বেশ্যাচারসম্পন্ন। তাহাপেক্ষা ছত্রান্ন অনেক উৎকৃষ্ট, অনেক শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয়।

এই বলিয়াই তিনি রঘুনাথকে আপনার নিকটে আনাইলেন এবং সেদিন প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা দিয়া নিজ শ্রীহস্তে তাঁহার প্রিয় আরাধ্য গোবর্দ্ধনশিলা এবং গুঞ্জামালা রঘুনাথকে প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, রঘুনাথ, তুমি আজ হইতে সাত্ত্বিকাচরণে এই শিলাবিগ্রহের সেবা কর! শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভ প্রেম-ধন পাইবে।

মহাপ্রভু স্বয়ং রঘুনাথকে বিগ্রহের সেবা-পূজার উপদেশ দান করিলেন।

রঘুনাথও সেইদিন হইতে ভক্তিগদগদভাবে মহাপ্রভুর উপদেশ মত এক কুজা জল ও আটটী তুলসীর মঞ্জরীসহ প্রভুদত্ত-বিগ্রহের সাত্ত্বিক সেবা করিতে লাগিলেন।

বিগ্রহ পাইয়া রঘুনাথের বাহ্যজ্ঞান দূর হইল, তিনি মহাপ্রভুর বিগ্রহদানের অভিপ্রায় এই বুঝিয়া লইলেন, মহাপ্রভু আমায় গোবর্দ্ধন শিলাদানে গোবর্দ্ধনে এবং গুঞ্জামালা দানে শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

বিগ্রহ-সেবায় তাঁহার ভ্রান্তি ও বাহ্যভাব দূর হইল। তিনি কৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রত্যক্ষ শ্যামসুন্দর যদুনন্দন দেখিলেন। তিনি জল-তুলসী সেবায় যে সুমধুর আত্ম-তৃপ্তি পাইতেন, ষোড়শোপচার পূজায় সে তৃপ্তি, অনুভব করিতেন না। ক্রমে সে সেবাও তাঁহার দূর হইল। তিনি মানসেই দিবারাত্রি তাঁহার কাম্যদেবের কমনীয় কনক-দীধিতি দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। দিবারাত্রিরও ভেদজ্ঞান থাকিত না।

অধিকদিন গত হইল না, ক্রমে তিনি ছত্রান্নও ত্যাগ করিলেন। পুরীর বাহিরে মহাপ্রসাদ বিক্রেতৃগণের যে সকল অন্ন বিক্রয় হইত না, যাহা তাহারা বিক্রয়াযোগ্য দুর্গন্ধময় হইলে ফেলিয়া দিত এবং স্বচ্ছন্দভোগিনী গাভীগণও যাহা উপেক্ষা করিত, তিনি তাহা স্বযত্নে আনিয়া জলধৌতপূর্ব্বক মাত্র লবণোপচারে নির্ব্বিকারপ্রাণে আহার করিতেন।

স্বরূপ একদিন তাহা দেখিয়া ছিলেন এবং রঘুনাথকে বলিয়া ছিলেন, রঘুনাথ, একি তোমার প্রকৃতি? একা একা অমৃত ভোগ কর, আমাকে বঞ্চিত কর কেন?

সেই দিন হইতে রঘুনাথ স্বরূপকে সে অমৃতে বঞ্চিত করেন নাই।

মহাপ্রভু গোবিন্দের প্রমুখাৎ একদিন তাহা শুনিলেন। পরদিন যখন স্বরূপসহ রঘুনাথ দুর্গন্ধময় পর্য্যুষিত প্রসাদান্ন মহানন্দে আহার করিতেছেন, তৎকালে মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে তথায় যাইয়া, "ওহে স্বরূপ, ওহে রঘুনাথ, তোমরা নির্জ্জনে বসিয়া কি অমৃতের সুখাস্বাদন লাভ করিতেছ, আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করিতেছ কেন?" বলিয়া তাঁহাদের হস্তস্থিত গ্রাস সাগ্রহে শ্রীহস্তে লইয়া স্বয়ং নিজ শ্রীমুখে প্রদান করিলেন। যেমন অপর গ্রাস লইবেন, অমনি স্বরূপ বিস্মিতনেত্রে প্রভুর শ্রীহস্ত ধারণ করিয়া—ক্ষুব্ধ-কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, প্রভু, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। এ অন্ন আপনার যোগ্য নহে।"

ক্ষুব্ধপ্রাণ স্বরূপ আর মহাপ্রভুকে সে অন্নাহার করিতে দিলেন না। মহাপ্রভু স্বরূপকে তদবস্থ দেখিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "স্বরূপ আমার, এই দেবভোগ্য অমৃতকে অযোগ্যাহার বলিতে নাই। ইহা অমৃতাপেক্ষাও সুস্বাদু। এই প্রসাদ ভক্ষণে ভক্ত ও ভগবান উভয়েই ধন্য হইয়া থাকেন। স্বরূপ লজ্জিত হইলেন এবং রঘুনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

সার্থক রঘুনাথ! তোমার এই আদর্শ বৈরাগ্যে সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবও স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন। তখন সাধারণ মানুষ ত অতি তুচ্ছ! বুঝিলাম, তাই ভাগ্যবান্ তুমি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া ছিলে! সর্ব্ববাঞ্ছিত

বিপুল অর্থ পদদলিত করিয়া পরমার্থ অনায়াসে হস্তগত করিয়াছিলে! ধন্য সৌভাগ্য তোমার নরদেব! তোমার স্মরণও জীবের মহাপুণ্য!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিপূর্ণ কাল-সিন্ধুর গভীর তলে বৈষ্ণবাকাশের পূর্ণশশী শ্রীচৈতন্যদেবের মহালীলার অবসান হইল। পুরুষোত্তম যাহার নিমিত্ত ধরায় আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, তাহা সাধিয়া চির-অন্তর্হিত হইলেন। ভক্ত রঘুনাথ ষোড়শ বৎসকাল শ্রীচৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন সেবানন্দে থাকিয়া আজ তাঁহার তিরোভাবে সকলই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আর তিলার্দ্ধকালও নীলাচলে থাকিতে পারিলেন না। প্রাণের আবেগে মহাপ্রভুর পূর্ব্ব উপদেশ মত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

এখন শ্রীবৃন্দাবনের পৌরাণিক ও বর্ত্তমান ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিষয় বলিব, আশা করি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ একটু ধৈর্য্য ধারণ করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন সমগ্র হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ এবং বৈষ্ণবগণের নিত্যানন্দময় পুণ্যধাম! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহা ক্রীড়াভূমি। সত্যযুগে কেদার নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম বৃন্দা ছিল। তিনি কৌমার্য্যাবস্থায় মহর্ষি

দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বনগমনপূর্ব্বক হরিমন্ত্র সাধনা করেন। তপস্বিনী বৃন্দা যেখানে বসিয়া কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার নামানুসারে তাহারই নাম বৃন্দাবন।

আবার কেহ কেহ বলেন, কুশধ্বজকন্যা তপস্বিনী তুলসীর নামান্তর বৃন্দা। তিনি যে স্থানে বসিয়া সিদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাহাই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নানাপুরাণে ইহার নানা উপাখ্যান লিখিত আছে। তন্মধ্যে মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই রমণীয় বৃন্দাবনের উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণিত, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি নিম্নে বলিতেছি।

যে সময় কংসপ্রেরিত অসুরসকল ব্রজধামে যাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, সেই সময় তিনি গোপরাজ নন্দকে পরামর্শ দিয়া ব্রজ হইতে তিনক্রোশ ব্যবহিত শ্রীবৃন্দাবনে থাকিবার সংকল্প স্থির করেন। দিনস্থির হইলে গোপরাজ নন্দ গোকুলবাসী গোপগোপীসহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিলেন। তখনকার লীলা-বিলাস-বর্ণনা অতি সুমধুর! বৃন্দাবনাভিমুখী সুসজ্জিত গোপগোপীরা কেহ রথে, কেহ শকটে, কেহ শিবিকায়, কেহ পদব্রজে যাইতেছে! হাসিমাখামুখ গোপশিশু কেহ বেণু বাজাইতেছে, কেহ করতালি দিয়া বীণার তারে ঝঙ্কার দিতেছে, কেহ বা স্বরযন্ত্রে সুর মিলাইয়া মোহন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নাচিতেছে, নানালঙ্কারাভরণা দিব্যবসনা হাস্যবিকশিতাননা সুমনা গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীরাধিকার সহচারিণী হইয়াছে! ভগবান বংশীধর বংশীবাদন করিতেছেন! বলরাম শিঙায় ফুঁক

দিতেছেন! রাখালগণ ব্রজ-বুলিতে গোচারণের গান গাহিতেছে। তাঁহারা সানন্দে চলিতেছেন। ক্রমে দিনের আলোক ম্লান হইতে লাগিল। ধীর সমীর বহিল, অদূর বৃন্দাবনের পাখীর সান্ধ্যধ্বনি চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। ব্রজত্যক্ত গোকুল-বাসী তখন গোকুল শূন্য করিয়া বৃন্দাবনে উপগত হইলেন। সে সময় বৃন্দাবন গভীর অরণ্য! নানা বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ! বহুবিধ হিংস্রজন্তু সমাকুল। গোপগোপীরা সেই ভীষণ অরণ্য দেখিয়া চঞ্চল ও ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবান কহিলেন, তোমরা আজ সচন্দন পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যে বনদেবতার পূজা দিয়া তরুমূলে অবস্থান কর, তাঁহার আশীর্ব্বাদে কল্য প্রভাতেই মনোমত গৃহাদি পাইবে। গোপগোপীগণ তাহাই করিল। তাঁহারা বনদেবতার পূজা করিয়া ভোজনান্তে রাত্রিকালে তরুমূলে আশ্রয় লইলেন এবং নিদ্রাভিভূত হইলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের সমুদয় হইল। তাহার মুক্তাশুভ্র স্নিগ্ধ-কিরণ স্বর্গের সুখ-সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতে ছিল। পত্র-পল্লবশোভিত তরুলতারাজি সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে পুলকে কম্পিত হইতে লাগিল। বনজ-পুষ্পসম্ভার পারিজাত গন্ধে আকুল করিয়া তুলিল। মরি মরি, স্বভাবজ বনভূমির কি শ্যামসুন্দর শোভা! মনে হয়, প্রকৃতি-দেবীর ইহাই শেষ লীলা-নিকেতন। ভগবানের ইচ্ছায় বৃন্দাবনে তখন রজনীতে দিবাভ্রম হইতে লাগিল। তাই আ।হংস শিখিকুল শ্যাম তরুশাখায় নৃত্য করিতে ছিল। নির্ভয় কুরঙ্গশিশু

মাতৃ-অঙ্ক হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবার লুব্ধনেত্রে মাতৃপৃষ্ঠে ক্রীড়া-রত হইতে ছিল! পিতামাতার স্বভাব-প্রাপ্ত মন্দগতিশীল করি-শাবক কোমল তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে ছিল। অদূরে লীলায়িতা যমুনা মা যশোমতীর নয়নমণি শ্যামসুন্দরের বংশীরব শুনিবার প্রত্যাশায় উন্মুখে প্রবাহিত হইতে ছিল! দেখিতে দেখিতে রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেল। অমনি তথায় শিল্পীগুরু বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার তিন কোটী শিল্পী অনুচর। তাহাদের হস্তে অপরিমেয় মণিসার, স্বর্ণ ও রত্ন। দেবধনাধ্যক্ষ কুবেরের অনুচর যক্ষগণ নানা বৈচিত্র্যময় প্রস্তরসকল বহন করিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণধ্যানপূর্ব্বক সেই বৃন্দাবনে পঞ্চ-যোজনবিস্তৃত নগর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন। অচিরেই নগর প্রস্তুত হইল। চতুর্দ্দিকে মণিশোভিত চতুঃশাল-গৃহ, তাহাতে গন্ধসার মিশ্রিত নানা বর্ণের প্রস্তরখচিত সোপান, লৌহসারময় কপাট ও শঙ্কু-পূর্ণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রত্যেক গৃহ-ভিত্তি চিত্র-পুত্তলিকাঙ্কিত ও সেই গৃহের অগ্রভাগ কজ্জলোজ্জ্বল করা হইল। বেদি, প্রাঙ্গণ, প্রাকার, উদ্যান, সরোবর, অট্টালিকা ও রাজপথপ্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য জনের যোগ্য মণিরত্নে মণ্ডিত করিলেন। সুবর্ণ ও রজত-কলস দ্বারে দ্বারে শোভা পাইতে লাগিল। সুগন্ধি-তৈলে মণিময় রত্ন-প্রদীপসকল প্রজ্বলিত হইল। স্বর্গ-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অপেক্ষা বিশ্বকর্ম্মা ভগবানের বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সমধিক শ্রেষ্ঠ করিলেন। ইহাতেও

তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তৎপরে ভগবানের ক্রীড়ার জন্য রাস-মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার চারিধারে মণিময় দর্পণ, রত্নময়ী বেদিকা, নয়ন-সুন্দর পুষ্পোদ্যান, নির্ম্মল স্ফটিক-শুভ্র সলিলপূর্ণ সুদীর্ঘ বিস্তৃত সরোবর শোভা পাইতে লাগিল। মণ্ডপমধ্যে কোথাও রত্নময় সিংহাসন, কোথাও চন্দন-অগুরু-কুঙ্কুম-বাসিত মনোবিনোদন লতাকুঞ্জ, কোথাও বা চন্দ্রকান্ত-মণিক্ষরিত জলরাশির কলশব্দিত নির্ঝরপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। সেই নয়ন-রম্য রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াও বিশ্বকর্ম্মা তৃপ্ত হইলেন না, তাই তিনি ভগবানের বিহার নিমিত্ত আরও ত্রয়স্ত্রিংশৎ চারু-মনোহর বন প্রস্তুত করিলেন। তন্মধ্যে ভদ্র-বন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন ভগবানের উল্লেখযোগ্য বিহার-ভূমি। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে ভগবানের ইচ্ছার সহায়তা করিয়া নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় অনুচরাদি সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতে জাগৃত গোপ-গোপীসকল সেই অলৌকিক নগর-দর্শনে একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শুভক্ষণে যথাযোগ্য জনে যথাযোগ্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভগবান এইখানে থাকিয়া কালীয়-দমন, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণ, রাসলীলাদি নানা লীলার অবতারণা করিয়া ছিলেন। এই শ্রীবৃন্দাবনধাম শুদ্ধ সত্ব ও ভক্তগণের আশ্রিত। ইহা নিত্য ত্রিগুণাতীত পূর্ণব্রহ্মানন্দে মগ্ন। দুঃখ-জ্বরা ও মৃত্যু বর্জ্জিত। ভগবান

এই স্থান হইতে এক পদও অন্যত্র গমন করেন না। ইহা দেবতাসিদ্ধগণসেবিত ও চিরবাঞ্ছিত। এখানকার অধিবাসিগণ আনন্দময় বিগ্রহ-স্বরূপ। এখানকার নারী লক্ষ্মী ও পুরুষগণ বিষ্ণুসদৃশ। এইস্থান অহঙ্কার, ক্রোধ, মাৎসর্য্য ও ভেদজ্ঞানশূন্য। এই স্থানের তরু সকলের গাত্রে প্রেমানন্দে পুলকোদ্গম হয় ও তাহারা অশ্রু বর্ষণ করে।

* * * * *

যদিও বর্ত্তমান সময়ে তাহার পূর্ব্ব গৌরবশ্রীর সম্পূর্ণ অভাব, তথাপি আমরা তাহা এখনও পুণ্যময় মহাতীর্থরূপে দেখিতে পাই। সেই আদি বৈভবময়ী ভগবানের লীলাভূমি নগরী বোধ হয়, পাঠানদিগের রাজত্বকালে একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া ছিল। দুই পাঁচজন ব্রজবাসী ব্যতীত আর কেহ তখন তথায় ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু-দেবদ্বেষী গজনীর সুলতান মহম্মদ যেরূপে ইহার শ্রীসম্পদ নষ্ট করেন, তাহার পর আর তাহার প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে কোন ভক্তি-প্রাণ হিন্দু প্রাণভয়ে তথায় গমন করিয়া ছিলেন কি না সন্দেহ। সুলতান মহম্মদ ১০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ প্রথম আক্রমণ করেন আর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার তিরোভাব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। ইহা পাঠান-রাজত্বের শেষ এবং মোগল-রাজত্বের সুচনাবস্থা। মোগলদিগের রাজত্ব-প্রারম্ভে হিন্দুগণ অনেকটা শান্তি অনুভব করিয়া ছিলেন। সেই সময় হইতেই ভক্ত তীর্থযাত্রিগণ বিলুপ্ত বৃন্দাবনে ভগবানের অতীত লীলা-

স্থান দর্শনে পুনরায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানুরাগী শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন ভক্তিবেগে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন, তখন তিনি ভগবানের লীলাস্থলের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে থাকেন। পরে শ্রীচৈতন্য নিজ-মহিমায় তাহার পুনরুদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিয়া শ্রীরূপসনাতনকে প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। পরে রঘুনাথ, শ্রীজীব, লোকনাথ, গোপালভট্টাদি আসিয়া ছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভগবানের অনেক লুপ্ত লীলাস্থল আবিষ্কৃত হয় এবং সেই শ্রীরূপসনাতনই শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায় প্রথম সিদ্ধ করিয়া ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই বৃন্দাবনেরই অতীত গৌরব ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহাদের গীতি-কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া এখনও এই মর-জগতে অমর। ইহা একটী মহাপীঠ। এইখানে সতীর কেশজাল পতিত হইয়া ছিল। ইহার তিন দিকে যমুনা বিরাজিত। গ্রীস পর্য্যাটক মহাত্মা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে বৃন্দাবন কালীয়বর্ত্ত নামে বর্ণিত। বোধ হয়, কালীয়নাগের আবর্ত্ত হইতেই ঐ নামকরণ করিয়া ছিলেন।

এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দির, গোপীনাথদেবের মন্দির, মদনমোহন-মন্দির, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, শ্রীরাধা, দামোদরাদির মন্দির শ্রীরূপসনাতনের প্রতিষ্ঠিত। এখানকার ব্রজবাসীদের কুটিরের নাম কুঞ্জ। উপস্থিত এখানে বানরের বিষম উপদ্রব ও সংখ্যায়

তাহারা অধিক। পুরাকালে যেস্থান দিয়া যমুনা প্রবাহিত হইত, এখন আর তাহার সে স্থান দিয়া গতি নাই। যেন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহেই তিনি শীর্ণা হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন এবং সেই প্রেমময়ের প্রেমধারা হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার স্মৃতি জাগৃত রাখিয়াছেন। এখানকার দেবমন্দিরসংলগ্ন প্রশস্ত ঘাটগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। তন্মধ্যে কেশীঘাট, বস্ত্রহরণঘাট, বংশীবট-ঘাটপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সেই ঘাট দিয়া যখন ধীর সমীরণ বহিয়া যায়, তখনই কবিকুলতিলক ভক্তরাজ মহাত্মা জয়দেব গোস্বামী-রচিত "ধীরসমীরে—যমুনাতীরে" প্রভৃতি ললিত-পদাবলী হৃদয়-মধ্যে তরঙ্গাকারে খেলিতে থাকে।

মনে হয়, এমন প্রেম-ভক্তির পবিত্র সুধাময় স্থান আর কোথাও নাই। এই পবিত্র পুণ্যভূমি দর্শনে ভক্তদিগের স্বতঃই শান্তিধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! নত মস্তকে ভগবানের করুণা ও ভক্তিভিক্ষা করিতে বাঞ্ছা জন্মে।

রঘুনাথ সেই শ্রীবৃন্দাবনে চলিতেছেন। সঙ্গে কেহই নাই। মাত্র প্রভুর বিরহাশ্রু ও প্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা আর গুঞ্জামালা। ভক্তি-প্রাণ গৌরাঙ্গসেবক রঘুনাথ আজ সত্যই প্রাণে প্রাণে ভিখারী। সেই করুণ-মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। তাঁহার শোকের বন্যায় বৃন্দাবনের পথ প্লাবিত হইতে ছিল। মর্ম্মভেদী দুঃখে পশুপক্ষীও করুণস্বরে আপনাদের করুণ চাঞ্চল্য বিকাশ করিতে ছিল।

রঘুনাথ যখন বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারই

মত স্বার্থত্যাগী শ্রীরূপসনাতন বৈরাগ্যের প্রেম-মুকুট পরিয়া প্রেমময় শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমেশ্বর ছিলেন। রঘুনাথ আসিয়াই তাঁহাদের পদে প্রণত হইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-সংবাদ দান করিলেন। সেই সংবাদে তাঁহারা উভয়েই রঘুনাথের সমবেদনায় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু উপায় কি? "তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন" ভাবিয়া ত্যাগী যোগী দুটী নীরব রহিলেন, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। রঘুনাথও কয়েক দিবস তাঁহাদের আশ্রমে থাকিয়া শেষে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সান্নিধ্যে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া কোনরূপে বাস করিতে লাগিলেন। সে বাসও তাঁহার সুখশান্তি বিধান করিতে পারিল না। কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম স্মৃতির ক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র তাঁহারই ধ্যানে মূক-বালকের ন্যায় অশ্রু ত্যাগ করিতেন। কিছু দিনের পর কঠোর সংযমে অনেকটা ধৈর্য্য আনিলেন। পরে শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ মত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের উদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল। আজ যাহা ভক্তিপ্রাণ বৈষ্ণবগণের প্রিয়-মধুর দর্শনীয় হইয়াছে, সেই মধুর সৌভাগ্যদাতাই ভক্ত শ্রীরঘুনাথ। তাঁহার অসাধারণ শ্রম, অলৌকিক চেষ্টা-যত্নের পুরস্কারস্বরূপ সেই রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আজিও তাঁহার মহা-কীর্ত্তির অক্ষুণ্ণ অমরতার জয় ঘোষণা করিতেছে। আজিও বৈষ্ণবের তৃষিত আকাঙ্ক্ষার তপ্ত-রৌদ্রে শীতলতার ছায়া দিতেছে।

শ্রীরূপসনাতন শ্রীরঘুনাথকে সহোদরের ন্যায় দেখিতেন। তাঁহারা সাগ্রহে ও ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গসেবক রঘুনাথের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যকাহিনী শুনিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। যদিও নানা প্রসঙ্গে রঘুনাথের জীবন-তরঙ্গ বহিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুর বিয়োগ-মহাশূল তাঁহার হৃদয় হইতে আর উদঘাটিত হইল না। তিনি কিছুতেই তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাই একদিন স্থির করিলেন, "গৌরাঙ্গ-বিরহিত জীবন দুর্ভার! ইহাকে বহন করা যায় না। অতএব আমি প্রভাতেই গোবর্দ্ধন-শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া এ পাপ প্রাণ ত্যাগ করিব। হউক আত্মহত্যা মহাপাপ।"

কিন্তু অকপট বন্ধু শ্রীরূপসনাতনকে ত এ কথা বলা হইল না, তাঁহাদিগকে না বলিয়া কিরূপে এ দারুণ সঙ্কল্প সাধন করিব? এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট আপন সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সে কথা শুনিয়াই তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। রঘুনাথের সঙ্কল্প নিন্দনীয় ও পাপময় ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার দুটী হাতে ধরিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথও তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে তিনি তাঁহার পাপ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি শ্রীরূপ-সনাতন রঘুনাথকে চক্ষের অন্তরালে রাখিতেন না।

এই বৃন্দাবনে অবস্থান কালে ভক্ত রঘুনাথ অনেকগুলি ভক্তি-গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে গুণলেশসুখদ, সুরাবলী, উপদেশামৃত,

মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্য-স্তব, কল্পবৃক্ষ, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, সংস্কৃত-স্তবমালা, দানচরিত ও মুক্তাচরিতপ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অনেক সুমধুর ললিত পদাবলীও রচনা করিয়া ছিলেন।

* * * *

কয়েক বৎসর পরেই ক্রমে ক্রমে শ্রীরূপসনাতন লীলা সাঙ্গ করিলেন। রঘুনাথের সব ফুরাইল। তখন তাঁহার পক্ষে বৃন্দাবন প্রকৃতই বন হইল। পক্ষীর বৃক্ষনীড়ও যাইল, বৃক্ষও ভাঙ্গিল। জল-ভাণ্ডের জল ও ভাণ্ড কিছুই রহিল না। আকুল রঘুনাথ আবার ব্যাকুল প্রাণে নীলাচলে ছুটিলেন। ভগবানের বৃন্দাবন-রাজ্যও তাঁহার চিত্ত-যন্ত্রণা দূর করিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে, যখন শ্রীরঘুনাথ প্রভু নিত্যানন্দদর্শনে পানিহাটে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পথে গোবর্দ্ধনের বিশ্বস্ত ভৃত্য রাধানাথ দাদা রঘুনাথের সহযাত্রী হইয়াছিল। যদিও দৈববিড়ম্বনায় রাধানাথের ভাগ্যে নিত্যানন্দদর্শন ঘটে নাই, তথাপি সেই সময় হইতেই তাহার অন্তরে ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় বৈরাগ্য-প্রবাহ বহিতে ছিল। সে যখন সেই চিন্তা-রোগ-যন্ত্রণায় কৃশ হইতে ছিল, বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ছিল, তখন সাধারণে তাহার একটা

উৎকট রোগ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই অবধি সে অনেক দিন মনে মনে কি ভাবিত আর অস্ফুট স্বরে কত কি বলিত। তাহার পর সে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই। এখন বহু বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। রাধানাথ এখন নীরব থাকে। দুইটী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবে। মাঝে মাঝে হাসে আর কাঁদে। কখন বা তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পত্নী ক্ষান্তমণি বহু প্রশ্ন করিয়াও স্বামী-রাধানাথের উত্তর পায় না! ক্ষান্তমণি প্রথমতঃ স্বামীতে অপদেবতার আক্রমণ বুঝিয়া প্রতিবাসীর পরামর্শে নানা দেশ হইতে নানা ওঝা আনাইয়া রাধানাথের চিকিৎসা করাইয়াছিল. কিন্তু অপদেবতা কিছুতেই বিশ্বপ্রেমিককে ত্যাগ করিল না। "রাধানাথ তাহার প্রকৃত প্রেমের লীলাস্থল" বুঝিয়া সে নিজ-শক্তি রাধানাথের প্রতি বিস্তার করিতেছিল। রাধানাথ তখন হইতেই ভাবোন্মত্ত হয়। তখন হইতেই সে দিনে তারা দেখিত. নিশীথে সূর্য্য দর্শন করিত। ফলে ফুল, ফুলে ফল, মহাবহ্নিতে জল, জলে প্রলয়াগ্নি সবই এক, তাহাতে তাহার পার্থক্য-বুদ্ধি জন্মিত না। তখন তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ দাসমহাশয়দিগের ধনজনশ্রীপূর্ণ সংসারকে শ্মশানের ভস্মরেণু অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে হইত। আবার তাহাকে ভগবানের আবাস ভাবিয়া প্রতি পলে নমস্কার করিত। তখন হইতে "আপনি কে" তাহা সে নিজে বুঝিতে পারিত

না। কখন ভাবিত, আমিই বিশ্বের আদি জীব ; আবার ভাবিত, আমি তৃণ হইতেও নীচ ! এখন রাধানাথ রাধানাথের আস্বাদ পাইয়াছে ! তাই ভ্রমর মধু পান করিয়া নীরব !

এদিকে দাসমহাশয়দিগের ক্রমপতন হইতে সম্পূর্ণ পতন ঘটিল। সে শ্রীসম্পদ্ আর কিছুই রহিল নাই। বৃদ্ধ হিরণ্য সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অলকা স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছেন। উন্মাদিনী বিজয়ার বিজয়োৎসব হইয়া গিয়াছে। রাঙাদিদিমা ইহার বহুপূর্ব্বে কাশীবাসিনী হইয়া ছিলেন, উপস্থিত তিনি মৃত কি জীবিত, সে সংবাদও জানিবার লোকাভাব। সাধ্বী যোগিনী রেবতী বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করিতে করিতে রোগশয্যাশায়ী শ্বশুরের অন্তিম আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ইহারই মধ্যের একটী দিনে পাপ পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িয়া ছিল। শেষ পুত্র-বিরহকাতর গোবর্দ্ধন সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কেবল দাসমহাশয়দিগের সংসার-সংক্রান্ত রাধানাথ দুর্ভর দেহভার লইয়া প্রণয়িনী-পত্নী ক্ষান্ত-মণির ভক্তি-গণ্ডীর বাহির হইতে পারে নাই। আজ তাহার সেই সুযোগ-মূহূর্ত্ত উপস্থিত।

ক্ষান্তমণির সীমন্তের সিন্দূর-বিন্দু থাকিতে থাকিতে তাহার জীবন-সন্ধ্যা ফুরাইল। সে আজ হাসিতে হাসিতে তাহার অনির্ণীত-রোগগ্রস্ত স্বামীদেবতার পদে মস্তক রাখিয়া স্বর্গগত আয়তি-লক্ষ্মীদের সহবাসিনী হইবার জন্য শেষ নিশ্বাসটী ত্যাগ করিল। যাইবার সময় কাহাকেও তাহার প্রাণের কোন কথা বলিয়া

গেল না। কেবল শবদেহের ভঙ্গীতে আঁকিয়া গেল, তাহার সংসার-শান্তি বড় স্নিগ্ধ—বড় শীতল! কেন না সে সাধ্বী নারী পতিদেবতা রাখিয়া মরিতে পারিয়া ছিল। ভাবোন্মত্ত রাধানাথ সেই পত্নী-বিরহ-রজনীতেই তাহার অতি সাধের চাঁদপুর হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু গম্য স্থান কোথায়? রাধানাথ তাহা পূর্ব্বে কিছুই স্থির করে নাই। সম্মুখে যখন যে পথ পাইতে ছিল, সে সেই পথের চিরযাত্রী হইয়া চলিতে লাগিল। কতদিনে ক'বে যে তাহার সমাপ্তি ঘটিল, অতীত গর্ভ কাহাকেও তাহা বুঝিতে বা দেখিতে দিল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলাচলের সমুদ্র-সৈকতে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্র-করদীপ্ত বালুকাপুঞ্জ একখানি ধবল আসনের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল। সম্মুখে জ্যোৎস্নাধৌত নীলোর্ম্মি বেলাহত হইয়া সেই আসনের সৌন্দর্য্য সাধন করিতে ছিল। স্থানে স্থানে শুক্তাভা চন্দ্রজ্যোতির সহিত আপন সৌন্দর্য্যের সমালোচনায় আপনার অপ্রাধান্য স্বীকার করিতে ছিল না। লীলায়িত তরঙ্গগুলি রজনীর নীরবতার মাত্রায় গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন করিতে ছিল। তটভূমির অদূর বৃক্ষরাজির ঘন-বক্রশ্রেণী নীলরেখার আকারে বিশ্বপতির অনুপম সৌন্দর্য্যের স্মৃতি জীব-

হৃদয়ে আঁকিতে ছিল। রঘুনাথ তখন সেই নির্জ্জন সমুদ্র-সৈকতে রজনীর নীরব ক্রোড়ে একাকী সমাসীন ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে যে শান্তি লাভের জন্য ঝঞ্ঝার বেগে নীলাচলে আসিয়া ছিলেন, সে শান্তি আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। এক গৌরাঙ্গ বিরহানলই দিন দিন দ্বিগুণিত ভাবে দহন করিতে লাগিল। এক তিলার্দ্ধকালও শান্তি আসিল না। "হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ" "হা মহাপ্রভু, হা মহাপ্রভু" করিতে করিতেই তাঁহার জীবন সরোবর শুষ্ক হইতে ছিল। মহাপ্রভু যেখানে যেখানে যাইতেন, যেখানে যেখানে থাকিতেন, রঘুনাথ প্রাণের আবেগে সেই সেই স্থানে উন্মাদের ন্যায় ছুটিতেন। ভাবিতেন, সেইখানে বুঝি আমার প্রেমের ঠাকুর প্রাণের গৌরাঙ্গ রহিয়াছেন। কিন্তু তথায় মহাপ্রভুর অদর্শনে সে আবেগ তাঁহার ভিন্নাকার ধারণ করিত। অমনি তিনি "হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কখন বা ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠন করিতেন। মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইত। আজ আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে মাঝে মাঝে বালুকায় গড়াগড়ি দিয়া সংজ্ঞা হারাইতেছেন। কখন বা গৌরাঙ্গ পাদপদ্ম ভাবিতে ভাবিতে এক গভীর ভাব-রাজ্যে চলিয়া যাইয়া নিশ্চল হইতেছেন। ভাবোন্মত্ত রঘুনাথ আজ সেই ভাববশে ছুটিয়া ছুটিয়া সমুদ্র-তীরে সমাগত আহা এইখানে—এই বালুকাসনে—এই শুভ্র চন্দ্রালোকে তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের রাজেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তজনসঙ্গে মধুর

সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন! তাই তিনি আজ ভাবের প্রেরণায়—ভাবের নিষ্ঠায় সেই মহাভাবময় মধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। ঐ যে সেই মাধবের মধুর বংশীধ্বনির মত সুমিষ্ট মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন! ঐ যে সেই সমুদ্র-তরঙ্গালোড়িত মৃদঙ্গ-করতালের সুমধুর গম্ভীর বাদ্য! রঘুনাথ তাই সেই সৈকতের বালুকাসনে বসিয়া সেই মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিতেছেন! কর্ণ ভরিয়া গেল! ভাবের মাদকতা আসিল। চক্ষু নিমীলিত হইল! বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইল। সেদিন আশ্বিনের শুক্লা-দ্বাদশী তিথি! ভাবোন্মত্ত ভাবুক-ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণপ্রিয় ধন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু রঘুনাথ ভাব-মহাযোগে সেইদিনে চির-জন্মের মত ভবরাজ্য ত্যাগ করিয়া ভাবরাজ্যে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অমনি গর্জ্জিত সমুদ্র-তরঙ্গ অনন্ত সিন্ধুজলে বিলীন হইল! ধীর সমীর বহিতে লাগিল। চন্দ্রালোক নীলাচল সমুদ্ভাসিত করিল। ঐ ঐ যায়—ভাবের কান্তি চন্দ্রলেখার মধ্য দিয়া ভাবের লীলায় ঐ যায়! ঐ সেই শ্রীরঘুনাথের মহদাত্মার মহাপুণ্যের শ্বেত-শুভ্র উজ্জ্বল রেখা!

এস প্রেমিক—এস ভাবুক—একবার ভাবের প্রাণে ভাবের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিয়া যাও—তোমার হৃদয়ের ভাবময় দেবতা ঐ কি না?

এস বিলাসি! এস বিষয়ান্ধ ধনি! দেখিয়া যাও, এ সংসারে জয় কার? তোমার না দীনদরিদ্র ভক্তি-প্রাণ ভক্তের?

দাঁড়াও—দাঁড়াও দরিদ্র-নারায়ণ! তোমার পদে পুষ্প-চন্দন দান করি!

দাঁড়াও—দাঁড়াও অশরীরী উজ্জ্বল-রশ্মিধারী ধীর শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি! একবার দাঁড়াও, আজ তোমাকে আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্তির অর্ঘ্য ঢালিয়া দিই!

দাঁড়াও ত্যাগী মহাপুরুষ পূজ্যবর দেব! তুমি আমাদের বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, ভক্তের গৌরব—বৈষ্ণবের গৌরব! তাই বলি, একটু দাঁড়াও, যদি আমরা তোমাকে দেখিয়া—তোমাকে আদর্শ করিয়া এই মায়া-পঙ্কিল সংসার-হ্রদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করি! তোমার নামে পুণ্য! তোমার ধ্যানে পুণ্য! তোমার মূর্ত্তি—জ্ঞেয়, ধ্যেয়, রম্য ও পুণ্যময়!

সম্পূর্ণ